নারী-প্রশস্তি

শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলা দেবী

নারী-প্রশস্তি

শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলা দেবী

প্রকাশক ঃ
শ্রীচুণীলাল রায়চৌধুরী
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, এস্-পি

প্রথম প্রকাশ—১৩৬০
দ্বিতীয় প্রকাশ—আষাঢ়, ১৩৭৭

প্রুফরীডার ঃ
শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মুদ্রাকর ঃ শ্রীঅমূল্যকুমার ঘোষ
সৎসঙ্গ প্রেস, পোঃ সৎসঙ্গ
দেওঘর (এস-পি)

মূল্য—টাকা 30

অর্ঘ্য

অমায়িক, উদার-চরিতা, পবিত্র-স্বভাবা, সর্ব্বজনপূজ্যা, সাক্ষাৎ
দেবীতুল্যা, মাতৃসমা আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরা
শ্রীযুক্তেশ্বরী সরসীবালা দেবীর করকমলে

পূজনীয়া দিদি,

আমার আজিকার এ জীবন আপনারই দান। শৈশবে পিতৃহারা হইয়াছিলাম। সহায় ছিল না—আশ্রয় ছিল না। সংসারের কুটিল আবর্ত্তে স্রোতের ফুলের মত কোথায় ভাসিয়া যাইতাম,—অখ্যাত, অজ্ঞাত—কেহ জানিত না। সেই অনাদৃত, অবহেলিত, তুচ্ছ পুষ্প-কোরকটিকে আপনিই পরম যত্নে, অতি সমাদরে আহরণ করিয়া আপনার পবিত্র গৃহের শুচিশুভ্র পুষ্পদানিতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য মহৎ বা বৃহৎ কোন সম্ভাবনা নিহিত ছিল কিনা একমাত্র পরমপিতাই জানিতেন; মানুষের তাহা জানা তখন সম্ভব ছিল না। আপনার চেষ্টায়, আপনার যত্নে, আপনার স্নেহে যদি কোন সুগন্ধ তাহা হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে, সে আপনারই কৃতিত্ব ও দয়ার দান। তাই তাহা আপনারই প্রাপ্য। সমগ্র জীবন অঞ্জলি ভরিয়া দান করিলেও যাঁহার ঋণ এক কণিকাও পরিশোধ হয় বলিয়া মনে করি না—তাঁহার পাদপদ্মে এ ক্ষুদ্র উপহার অর্পণ করিতে মন স্বতঃই সঙ্কুচিত হয়! কিন্তু

ভক্তও তো তাহার ভগবানের চরণে তুচ্ছ বনফুলের অঞ্জলি দিয়াই তৃপ্ত হয়। আমিও সেই সাহসেই আমার এ অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ পুস্তকখানি হৃদয়-সিঞ্চিত ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিয়া আপনার রাতুল চরণে অর্পণ করিয়া নিজেকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলাম। আপনি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করুন।

আপনার চিরস্নেহাভিলাষিণী
দীন সেবিকা
শ্রীমতী সর্ব্বমঙ্গলা দেবী

দেওঘর
১৩৬০ বঙ্গাব্দ

দুই-চারিটি কথা

প্রত্যহ সকালে আমরা খবরের কাগজ খুলিয়াই কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই—দিকে-দিকে অনাচার, অবিচার আর অত্যাচার। শোষিতের আর্ত্তনাদ, উৎপীড়িতের দীর্ঘশ্বাস আর বঞ্চিতের হাহাকার। খবরের কাগজের এই হইল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা-পরিবেশন। মন যায় খিঁচ্‌ড়ে, প্রাণ ওঠে মূস্‌ড়ে—তাই চলনা হয় অবশ-শিথিল। কেন পত্রিকা দিনের পর দিন এমন সব খবর প্রকাশ করিয়া মানব-চিত্ত বিহ্বল করিয়া তোলে? কেন সে এক দিনের তরেও ইহার বিপরীত ঘটনা পরিবেশন করিতে পারে না? কি করিয়া পারিবে? দেশে অহরহ যাহা ঘটিতেছে তাহারই কিয়দংশ প্রকাশ করিয়া সে লোকচক্ষে তুলিয়া ধরিতেছে। কিন্তু কেন? এই অত্যাচার, এই অবিচারের প্রতিকার করিবার কি কেহই নাই? না, আজ দেশে তেমন মানুষ নাই যে এই দেশজোড়া অনাচারের-অবিচারের মোড় ফিরাইয়া ন্যায়, নীতি এবং সত্যের পথে দেশকে চালাইতে পারে। নাই তেমন কেহ, যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া আর্ত্তের ক্রন্দন ও ব্যথিতের হাহাকার রোধ করিতে পারে। কিন্তু কেন নাই? ভারতভূমি বীর-প্রসবিনী। যুগ-যুগ ধরিয়া এই ভারতমাতা কত শত বীর পুত্র প্রসব করিয়া সংস্কৃতিতে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে ভারতকে বিশ্বের দরবারে সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আজ কেন এমন হইল কেন সে আজ সেই আসন হইতে বিচ্যুত হইবে? বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু, নেতাজীর মত সন্তান প্রসব করিতে ভারতমাতা কি অক্ষম?

বিংশ শতাব্দীর ভারত কি সুসন্তান প্রসব করিতে ভুলিয়া গিয়াছে? কিন্তু কেন এমন হইল? কি ইহার কারণ? ইহার জন্য দায়ীই বা কে? দেশ জোড়া আজ এই বিরাট জিজ্ঞাসা!

কিন্তু আমরা জানি, নারী ধাত্রী, নারী প্রসূতি, নারী মাতা। সন্তান ধারণ করিবার ক্ষমতা, প্রসব করিবার ক্ষমতা—আবার সন্তানের দেহ-মনের পরিমাপ সাধন করিয়া একটি বিশেষ নির্দ্দিষ্টরূপে তাহাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার ক্ষমতা নারীতেই বর্ত্তমান। নারী তাই মাতা ও জননী। আমাদের পুরাণে আছে, দেবগণকে অসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেখিয়া ভগবতী উমা মহাদেবকে তপে তুষ্ট করিয়া অসুরবিনাশী কার্ত্তিকেয়কে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। অসুরারি কার্ত্তিকেয়কে পুত্ররূপে লাভ করিয়া দেবগণকে বিপদ-মুক্ত করিবার ক্ষমতা মাতা ভগবতীতেই বর্ত্তমান। আবার, সেজন্য মাতার সাধনারও প্রয়োজন। দেহে-মনে শুচি হইয়া, উপযুক্ত সাধনার দ্বারা সুসন্তান লাভ করিবার ক্ষমতা নারীকে অর্জ্জন করিতে হয়। সুসন্তান অনায়াস-লভ্য নহে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "আদর্শ মাতাই আদর্শ সন্তানের অধিকারী। যিনি ধর্ম্ম ও ন্যায়পরায়ণা, আদর্শবাদী, তাঁর কাছেই জগতের শ্রেষ্ঠ রত্ন নিজে হ'তেই আসে, সে রত্নের জন্য জগৎ-সমুদ্র মন্থন করতে হয় না, দেশে-দেশে সে-রত্নের জন্য ঘুরে বেড়াতে হয় না, আপনিই আসে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "যে সন্তান সাধনার দ্বারা জন্মলাভ করেছে—সেই আর্য্য। আর অনাহূতের মত যে এসেছে, সে অনার্য্য সন্তান।" দেশের বর্ত্তমান এই দুর্দ্দিনের অবসান ঘটাইতে হইলে, দেশকে আবার সুস্থ ও পুনর্জীবিত করিতে

হইলে—আবার ভারতকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইতে হইলে—সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন আদর্শ মাতা, আদর্শ বধূ ও আদর্শ কন্যা। কারণ, নারী-জাতিকে ভুলিলে চলিবে না, "The hand that rocks the cradle rules the world." আর সময় নাই—এখন হইতে অবহিত না হইলে সম্মুখে ঘোর দুর্দ্দিন।

কেমন করিয়া এ সমস্যার সমাধান সম্ভব—কেমন করিয়া, কিরূপে নারীকে পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া পুরুষের বাহুতে শক্তি ও হৃদয়ে ভক্তি দিয়া জীবনযুদ্ধে তাহাকে জয়ী করিয়া তুলিতে হইবে, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস আমি আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। জানি না কতটুকু কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি। দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, জ্ঞান অপরিসর, বুদ্ধি-বিবেচনা অতি সামান্য। আমার পক্ষে এরূপ গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতারই পরিচায়ক হইয়াছে। তথাপি দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে প্রাণের আকুলতা, মনের ব্যাকুলতা চাপিতে না পারিয়া, এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু করিয়া ফেলিলাম। আশা করি সুধী ও বিদ্বৎ সমাজ আমার এই ঔদ্ধত্যকে মার্জ্জনার চক্ষে দেখিবেন। আর, কোন সহৃদয় পাঠক যদি পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ইহার ভুল-ত্রুটি নির্দ্দেশ করিয়া পুস্তকখানির উন্নতি সাধনে সাহায্য করেন তাঁহার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকিব! কারণ, ইহাই আমার প্রথম রচনা। ভুল-ত্রুটি থাকা খুব সম্ভব। আর একটি কথা, যাঁহাদের উদ্দেশ্যে এই বইখানি আমার লেখা—দেশের সেই মা, বোন ও মেয়েদের চিত্তে যদি ইহা এতটুকুও রেখাপাত করিতে পারে, বা তাঁহাদের চলার পথে যদি ইহা কোন আলোকপাত করিতে

পারে তবেই আমি আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

প্রথমে বইখানি প্রবন্ধাকারে ক্রমান্বয়ে তিনখানি পত্রিকা মারফৎ বাহির হইয়াছে। তাই অগ্র-পশ্চাৎ সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য হয়তো কোথাও-কোথাও দ্বিরুক্তি দোষ ঘটিয়া থাকিতে পারে।

পুত্র-প্রতিম শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, চুণীলাল রায়-চৌধুরী ও মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নে আমার লিখিত প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে বাহির হইল। তাহাদের প্রতি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ রহিল। ইতি—

লেখিকা

ভূমিকা

আমার পরম পূজনীয়া মাসিমা'র লেখা নারী-প্রবৃত্তি পড়লাম। ইতিপূর্ব্বে যখন পুস্তিকাখানির প্রবন্ধগুলি মাসিক আলোচনা, ত্রৈমাসিক ঋত্বিক্‌ ও দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তখনই সেগুলি প'ড়ে ভালো লেগেছিলো খুব। ভূমিকার কয়েকটি কথা সেই সুরের প্রতিধ্বনি। * * *

মানুষ পৃথিবীতে আসে-যায়। যতদিন দুনিয়ার বুকে থাকে সে চায় সুখ ও শান্তি। এই কামনা নারী-পুরুষ-নির্বিবশেষে প্রত্যেকেরই চিরন্তন কামনা। আদর্শ-পরায়ণ, বৈশিষ্ট্যপালী জীবন হ'লে এই কামনা ফলে-ফুলে সুশোভিত হ'য়ে গ'ড়ে তোলে আনন্দের লীলা-নিকেতন।

আর, এর ব্যতিক্রম হ'লে সেই আদর্শ-বিচ্যুত, বৈশিষ্ট্যহীন জীবন-চলনার প্রতি পদক্ষেপ সৃষ্টি করে সংঘাত ও বিপর্য্যয়। আসে দুঃখ, অশান্তি ও দুর্দ্দশা।

জীবনের ভিত্তি হলো আদর্শ-নিষ্ঠা। আদর্শ-নিষ্ঠ সংযমী জীবন করে বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ, তাই সংযম হলো জীবনের সৌন্দর্য্য। নিয়ন্ত্রিত জীবনের মাধুর্য্য হলো—ভক্তি, নিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা, উদারতা, মহত্ত্ব, দয়া, ক্ষমা ও সেবাপরায়ণতা। এই হলো জীবনের সম্পদ—সৌন্দর্য্য।

ব্যষ্টি থেকে সমষ্টি জীবনের উন্নয়ন ও সুখ-শান্তি নির্ভর করে চলনার সার্থক সমন্বয়ের উপর।

সংসারক্ষেত্রে পুরুষের আদর্শ জীবন ও বৈশিষ্ট্যপালী চারিত্রিক

নিয়ন্ত্রণ যেমন অপরিহার্য্য সেইরূপ সম-দায়িত্বের ভার মাতৃজাতির জীবনেও।

মাতৃজাতির সেবা, সংরক্ষণ, সুপ্রজনন, শুশ্রূষা প্রভৃতি গুণাবলীর উপর নির্ভর করে তার জীবনের পরম সার্থকতা।

নিষ্ঠা-শুদ্ধি-সমন্বিত নারীর এই আদর্শ-জীবন সঞ্জীবিত করে গৃহ-জীবনকে—দাম্পত্য জীবনে রচনা করে মধু-সম্বন্ধ। নারী-জীবনের সার্থকতায়, মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশে সন্তান-জীবন হয় বিকশিত। সুসন্তানের আবির্ভাবে হয় সমাজদেহ বলিষ্ঠ ও সুসংগঠিত—এই সুসংগঠিত সমাজই রাষ্ট্রীয় বনিয়াদকে করে সুদৃঢ়। সুদৃঢ় রাষ্ট্রীয় জীবনের বনিয়াদ জাতিকে করে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিষয়ে বরেণ্য। তাই নারী মা, নারী পালয়িত্রী ও রক্ষয়িত্রী।

পুস্তিকাখানিতে মাতৃজাতির জীবনের খুঁটিনাটি বহু বিষয় অতি সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে।

আমি আশা করি এই পুস্তিকাখানি প্রতি প্রত্যেকের জীবন-পথের পাথেয়-স্বরূপ হইবে। ইতি—

সৎসঙ্গ শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

দেওঘর (বড়দা)

কুমারী কন্যার শিক্ষা

কুমারী কন্যার শিক্ষা, সংস্কার, আচার, ব্যবহার, চালচলন ও সাজসজ্জা কি প্রকার হইলে সংসারে তথা জাতীয় জীবনে কল্যাণ আনয়ন করিতে পারে আমরা একে-একে সেই আলোচনা করিব।

সমস্ত শিক্ষারই মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বৈশিষ্ট্যের পরিপূরণ। মেয়েদের বৈশিষ্ট্যে আছে—নিষ্ঠা, ধর্ম্ম, শুশ্রূষা, সেবা, সাহায্য, সংরক্ষণ, প্রেরণা ও প্রজনন। এই গুণগুলির সম্যক বিকাশই নারীত্বের পূর্ণতা। সুতরাং যে-শিক্ষার সাহায্যে মেয়েদের চরিত্রে এই গুণগুলির সম্যক বিকশিত হইবার সুযোগ পায় তাহাই হইল মেয়েদের আদর্শ শিক্ষা।

মেয়েরা ভাবী গৃহিণী ও জননী। মাতৃত্বেই নারীর চরম ও পরম সার্থকতা। তাই প্রকৃতিদেবীও মেয়েদের বয়সের সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের দেহ ও মন মাতৃত্বের সকল সম্ভারে সুসজ্জিত করিয়া তোলেন। মেয়েদের শিক্ষাও তাই এমন হওয়া উচিত যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে সুগৃহিণী ও সুমাতা হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে।

অনেক সময় বয়স্কা কুমারী মেয়েরা নির্জ্জনে বয়ঃপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিকট পড়াশুনা করে। এটা অবিধি। বিখ্যাত মনীষী 'হল' বলেন —"নর-নারীর দৈনন্দিন ঘনিষ্ঠতার ফলে উভয়ের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি-প্রবণতা ও তারুণ্যের দীপ্তি লোপ পাইতে চাহে, এবং এই ব্যাপারে বালকদের চেয়ে মেয়েদের ক্ষতি হয় বেশী।" তাই কুমারী জীবনে যাহাতে নিঃসম্পর্কীয় কোন পুরুষের ঘনিষ্ঠ ছাপ তাহাদের মস্তিষ্কে না পড়ে সে বিষয়ে অভিভাবকদের সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি রাখা উচিত। অন্যথায়

তাহাদের দ্বিধাবিভক্ত দ্বন্দ্বভরা মন তাহাদিগকে নারীত্ব, বধূত্ব ও মাতৃত্বের কেন্দ্রানুগ আদর্শ হইতে স্খলিত করিয়া তুলিবে। অন্য কোন শিক্ষাই তাহাদের জীবনকে সুষমামণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারিবে না।

তাই মনে হয়—"কুমারী মেয়েদের পিতার প্রতি অনুরক্তি থাকা, তাঁহার সেবা ও সাহায্য করা, তাঁহার সহিত আলাপ বা আলোচনা করা উন্নতির প্রথম ও পুষ্ট সোপান।" যাহাদের সে সুবিধা নাই তাহারা কোন শিক্ষিতা মহিলার নিকট পড়াশুনা করিলে ভাল হয়। তাহাও সম্ভব না হইলে পিতার সমতুল্য বা অধিক বয়স্ক কোন শিক্ষকের নিকট পড়াশুনা করিতে পারে। অবশ্য স্কুলে বা কলেজের ক্লাসে অধ্যয়ন দোষাবহ নহে।

বেদমাতা গার্গি, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি বহু ধী-শক্তি-সম্পন্না মহিয়সী মহিলার দৃষ্টান্ত আমাদের ভারতের ইতিহাসে বিরল নহে। এই সকল নারী-শিরোমণি মহিলাগণ তাঁহাদের জীবনব্যাপী সাধনা দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের অধিকাংশকেই বধূ হইতে হইবে, মাতা হইতে হইবে। তাই তাহাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষায় সহিত উপযুক্ত গৃহকর্ম্ম, সেবা-শুশ্রূষা, সন্তান-পালন, স্বাস্থ্যচর্যা, সদাচার, চারুশিল্প, কুটিরশিল্প প্রভৃতি কতকগুলি শিক্ষা যোগ করিয়া দেওয়া একান্ত দরকার। তাহা হইলে তাহারা বর্ত্তমানের এই অর্থনৈতিক দুর্দ্দিনে তাহাদের স্বামী-পুত্রকে ঘরে বসিয়াই বহু প্রকারে সাহায্য করিতে পারিবে।

নারীই গৃহলক্ষ্মী,—গৃহকে, সংসারকে, সর্ব্বতোভাবে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তোলার দায়িত্ব নারীরই। আর, সে-ক্ষমতা জগদীশ্বর

তাহাদেরই পূর্ণ মাত্রায় দিয়াছেন।

মেয়েদের শিক্ষা সাধারণতঃ চাকুরী করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়া মোটেই সমীচীন নহে। ইহাতে বহু নিঃসম্পর্কীয় পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সাধারণ মেয়েদের জীবন বিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী; —ইহা প্রত্যক্ষ চিন্তাশীল ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন।

কুমারী মেয়েদের শিক্ষার আর একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়-সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিব। বিশেষ করিয়া এই শিক্ষাটির উপরই কুমারীদের ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হইবে কিংবা দুঃখের হইবে—তাহা জাতীয় জীবনে কল্যাণ প্রসব করিবে অথবা বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিবে তাহা অনেকখানি নির্ভর করে। ইহা হইল কন্যার পিতৃকুল হইতে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ পতি মনোনয়ন করিবার শিক্ষা। প্রত্যেক কুমারীরই গর্ব্বের সহিত স্মরণ রাখা উচিত, তাহাদের মধ্যে যে জীবন প্রবাহিত হইতেছে, তাহা তাহাদের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পুরুষদিগকে বহন করিয়া— যাঁহাকে অর্ঘ্য দিয়া তাহাদের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পুরুষগণ প্রীত ও ফুল্ল হন, যাঁহার বা যে-বংশের চরণ স্পর্শে তাহারা ধন্য হন, নতজানু হইয়া শুধু তাঁহারই চরণে অবনত হওয়া যায়, তাঁহাকেই বরণ করা যায়—আর শুধু তাঁহাকেই স্বামী সম্বোধন করিয়া নিজে কৃতার্থ হওয়া, উজ্জ্বল হওয়া যায় এবং বংশ ও জাতিকেও উন্নত করা যায়। শ্রেষ্ঠের প্রতি আসক্তিতে মস্তিষ্কে একটি টান লাগিয়াই থাকে—আর তাহারই দরুণ মানুষের মস্তিষ্ক বিশেষভাবে সাড়াপ্রবণ হয় অর্থাৎ গ্রহণক্ষম হয়। বরণ করিতে হইলে প্রথমেই দেখা উচিত স্বামীর আদর্শ কি বা কেমন— আর, তাঁহার সেই আদর্শ কর্ম্মের আগুনে নিজেকে আহুতি দিয়া সার্থক

হওয়ার আকূতি নারীর কতখানি দুর্ব্বার। যদি সে কোন বিশেষ পুরুষের সহধর্ম্মিণী হওয়ার প্রেরণা নিজের মধ্যে লাভ করে—আর যদি তিনি জাতি, বর্ণ, বংশ ও বিদ্যায় বরণীয় হন অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ হন, তাহার পূর্ব্বপুরুষের অর্ঘ্যণীয় বলিয়া বিবেচিত হন তবে তিনিই তাহার স্বামীরূপে গ্রহণীয় হইতে পারেন।

নারীর মনে রাখিতে হইবে—তাহার ভালবাসা যেখানে যেমন ভাবে ন্যস্ত হইবে—ফলের উদ্ভবও তেমনতরই হইবে সন্দেহ নাই।

"বিবাহ মানুষের প্রধান দুইটি কামনাকেই পরিপূরণ করে ;—তার একটি উদ্বর্দ্ধন, অন্যটি সুপ্রজনন ;—অনুপযুক্ত বিবাহে এই দুইটিকেই খিন্ন করিয়া তোলে ;—সাবধান, বিবাহকে খেলনা ভাবিও না, যাহাতে তোমার জীবন ও জনন জড়িত।" —শ্রীশ্রীঠাকুর।

বিবাহে পুরুষ অপেক্ষা নারীর দায়িত্বই বেশী—সুসন্তান লাভ করা না-করা প্রধানতঃ নারীর উপরই নির্ভর করে। কারণ, সুপ্রজননকে নিয়ন্ত্রিত করে নারীর ভাব যাহা পুরুষকে উদ্দীপ্ত করিয়া নারীতে আনত করে। তবেই নারী যাহাকে বহন করিয়া কৃতার্থ ও সার্থক হইবে বিবেচনা করে—গুরুজনের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহাকেই বর বলিয়া বরণ করা উচিত। তাই, বিবাহে পুরুষকে বরণ করার ভার নারীতে থাকাই সমীচীন। তাই, প্রাচীনকালে সতী, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি নারীগণ তাঁহাদের নিজেদের পতি নিজেরাই অতি সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাচন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিভাবকগণও এই গুরুদায়িত্ব ভার তাঁহাদের সুশিক্ষিতা এবং সর্ব্বগুন-সমন্বিতা কন্যাগণের উপর ন্যস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন। যেখানে

কন্যাদের বাল্যবিবাহ হয় সেখানে এ শিক্ষার প্রশ্ন আসে না। সেখানে অভিভাবকগণই তাঁহাদের বিবেচনানুসারে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিয়া আনেন। অন্যথায় কন্যাগণ এরূপ শিক্ষায় শিক্ষিতা হওয়া প্রয়োজন—যাহাতে তাহারা কোনমতেই কোন একটি বিশেষ গুণ সমন্বিত কোন নারীমুখীন, আদর্শচ্যুত, নীচকুলোদ্ভব পুরুষকে পতিত্বে বরণ না করেন। "বর" মানে শ্রেষ্ঠ—"বৃ"-ধাতুর মানে বরণ করা ও প্রার্থনা করা। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—যে-সমস্ত গুণ থাকিলে পুরুষ পুরুষ হয়, সেই সমস্ত গুণ সবর্ণ (সমান বা উৎকৃষ্ট বর্ণ), বিদ্বান, পুরুষত্ব বিষয়ে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষিত, যুবা, জনপ্রিয় ব্যক্তিই বর হইবার উপযুক্ত। কেবল বিদ্যা বা কেবল জাতির দ্বারা পাত্রতা হয় না, যাহার বিদ্যা ও জাতি দুই-ই আছে সেই পাত্র।

যে-নারী যে-পুরুষের মনোবৃত্তির অনুসরণ সুখের বলিয়া মনে করিয়া তাহাতে ধন্য হয়, হৃষ্ট হয়, সার্থক হয়—পুরুষকে হৃষ্ট ও তুষ্ট করিয়া তোলে এবং তাই তার শারীরিক ও মানসিক পুষ্টি ও তুষ্টির উর্ব্বর উৎস।

সেই পুরুষ ও নারীর বর্ণ, বংশ, কর্ম্ম, বিদ্যা, দক্ষতা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি হিসাবে মিলন বাঞ্ছনীয়। এইরূপ মিলনেই নারী সুসন্তানের জননী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে।

বিবাহ

Man's love is of man's life a thing apart. 'Tis woman's whole existence.

—Byron

পুরুষের জীবন বহির্ম্মুখী, কর্ম্মক্ষেত্র বহু বিস্তৃত। বাহিরের কাজে নানা সমস্যার সমাধানে পুরুষের জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। গৃহ, ভালবাসা, নারী—পুরুষের হৃদয়ের একটি অংশকে মাত্র প্রভাবান্বিত করিতে পারে, সমগ্র জীবন বা কর্ম্মকে রঞ্জিত করিতে পারে না। অবশ্য, আদর্শপরায়ণ প্রকৃত পুরুষ—মহান্, উদার, পূরণকারী, সঙ্কীর্ণতার বহু উর্দ্ধে যে সমাসীন—শুধু তারই সম্বন্ধে ঐ কথা প্রযোজ্য। কিন্তু নারীর স্বভাব ঠিক ইহার বিপরীত। যে ধারণ করে, পালন করে, পোষণ করে সেই নারী। নারীর সহজাত সংস্কার বধূ হওয়া —মা হওয়া। একটি ছোট মেয়েকে মা বলিয়া ডাকিলে সে যত কোমল হয়, খুশী হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। একটি বালিকা অতি শিশুকাল হইতেই বৌ সাজিয়া পুতুল খেলে, সেই পুতুলকে ঘুম পাড়ায়, আদর করে, বিয়ে দেয়, এমনি ক'রে তার সুপ্ত মাতৃত্বকে পরিতৃপ্ত করে। কিন্তু একটি ছোট ছেলের খেলা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে কখনও খেলাঘর পাতিয়া সংসার সাজাইয়া বসে না, সে কখনও ছুটাছুটি, কখনও হয়তো লাঠি, ছোরা, বন্দুক নিয়ে রাজা-রাজা বা ডাকাত-ডাকাত খেলিতেই বেশী পছন্দ করে। এইগুলি লক্ষ্য করিলেই আমরা নারী-পুরুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তির পার্থক্যের

পরিচয় তাদের শিশুকাল হইতেই পাইতে পারি। তবু বিধির বিধান, সৃষ্টি রক্ষার উদ্দেশ্যে উত্তর জীবনে এই দুইটি সম-বিপরীত সত্তার জীবকে মিলিত হইয়া সংসার করিতে হয়। এই মিলনকেই আর্য্য-শাস্ত্রকারেরা বিবাহ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

বিবাহ মানে (বি-বহ্ + ঘঙ্)—বিশেষ প্রকারে বহন করা। এই বহন করার ব্যাপারে পুরুষ অপেক্ষা নারীর দায়ীত্বই বেশী, কারণ, শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক হইতেই বিবাহ নারীরই বেশী প্রয়োজনীয়। নারীর স্বভাব লতার মত, কোন উপযুক্ত সহকারকে অবলম্বন করিতে না পারিলে সে আপনি বাড়িতে পারে না, আর সুগন্ধি কুসুমে নিজে সুসজ্জিত হইয়া তাহার চারিদিক আমোদিত করিতে পারে না। তাই পরম উদাসীন, বহির্মুখী পুরুষকে সেবায়, সাহচর্য্যে, প্রেমে তৃপ্ত করিয়া আপনার নীড় বাঁধিবার কামনাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হয় নারীকেই। সেইজন্যই নারীকে সুস্থ, স্বস্থ, তৃপ্ত থাকিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া চলিবার জন্য আর্য্য ঋষিগণ বিবাহকেই নারীর শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র সংস্কার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। নারীর শিক্ষা ও সংস্কার শৈশব হইতেই এমনতর হওয়া উচিত যাহাতে সে মহাসতী উমার মত—মহাযোগী মহেশ্বরের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া তাঁহার প্রসাদ-স্বরূপ গণপতি, কার্ত্তিকেয়, লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে কোলে পাইয়া নারী-জীবন কৃতার্থ করিতে পারে।

অতি প্রাচীন কালে সমাজে নির্দ্দিষ্ট বিবাহ প্রথা ছিল না, নর-নারীর যথেচ্ছ মিলন প্রচলিত ছিল। নারী বহু পুরুষে এবং পুরুষ

বহু নারীতে আকৃষ্ট হইলেও দোষণীয় হইত না। কালক্রমে বহু পর্য্য-বেক্ষণের ফলে সমাজে বিবাহ ব্যবস্থা স্থাপিত হইল। উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু কোন অপরিচিত ব্রাহ্মণের দ্বারা তাঁহার মাতার প্রতি অশিষ্ট আচরণ দর্শনে অপমানিত হইয়া প্রথমে বিবাহ প্রথার নিয়ম করিলেন।

শাস্ত্রমতে বিবাহ আট প্রকার,—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ। বর্ত্তমানে ব্রাহ্ম এবং প্রাজাপত্য বিবাহই হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে। এই বিবাহে সদ্‌বংশজ, সচ্চরিত্র বরের বিদ্যাবুদ্ধি, চরিত্র প্রভৃতি বিশেষভাবে জানিয়া ধনরত্ন দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া কন্যাকে দান করিতে হয়। বিবাহ ব্যাপারে যেমন কন্যার সুলক্ষণ কুলক্ষণের বিচার-বিধি সমাজে প্রচলিত আছে, বরের বেলায়ও সে-বিষয় সমভাবে প্রযোজ্য।

"আত্মজাং রূপসম্পন্নাং মহতাং সদৃশে বরে"

—মনু ২৪।৯

"সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যাকে পিতামাতা অনুরূপ বরের হাতে সমর্পণ করিবেন, অন্যথা তাহাদের ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ হইবে।"

শাস্ত্রে অপাত্রে কন্যাদান অপেক্ষা কন্যা আজীবন কুমারী থাকাই শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—ইহাই ছিল প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। জগতে সুপুত্র অপেক্ষা প্রার্থনীয় সম্পদ আর নাই। তা'ছাড়া পুত্র দ্বারাই পিতৃঋণ শোধ করা যায়, তাই বিবাহ করা প্রত্যেকের বিশেষতঃ পিতার একমাত্র পুত্রের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই বিবাহ দ্বারাই মানুষ গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করে। চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সংসার ও সমাজ পরিপালন, অন্যান্য আশ্রমিগণের পরিপোষণ, এমন কি ইতর প্রাণিগণের পরিরক্ষা এই গার্হস্থ্যাশ্রমেই হয়। বস্তুতঃ গৃহস্থকে বাদ দিলে সমাজ অচল।

"The city that ceases to be a city of homes will cease to be a city at all."

—Mussolini

"যে নগরীতে গৃহস্থের গৃহ নাই, তাহা আর নগরী বলিয়া পরিচিত হইবে না।

—মুসোলিনী।

এই গৃহস্থের পক্ষে বিবাহ প্রকৃত ধর্ম্ম। আর্য্য ঋষিগণের বহু বিবেচনা-প্রসূত বিবাহ দ্বারা মানুষ মনোবৃত্ত্যনুসারিণী সহধর্ম্মিণী লাভ করে। সহধর্ম্মিণী ব্যতীত সংসার-আশ্রমের সমুদয় কর্ত্তব্য যথাযথ প্রতিপালিত হইতে পারে না। পতিব্রতা পত্নী কর্ত্তব্যপরায়ণ পতির সহচারিণী ও সহকারিণী হইয়াই তাহার নারী-জীবনের চরম ও পরম উৎকর্ষের দিকে যাইতে থাকে। এইখানেই নারীর নারীত্ব প্রথম বিকশিত হইবার সুযোগ পায়। স্বামীর সাহচর্য্যে তাঁহার সকল কর্ত্তব্য সম্পাদনের সুষ্ঠু সহায়তা করিতে-করিতেই সে তাহার উত্তর জীবনের সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। যে যত আদর্শ পত্নী হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে—আদর্শ পুত্র লাভের সৌভাগ্য তাহারই করায়ত্ব—তত নিশ্চিত। এ বিষয় আমরা পরে আরও ভালভাবে আলোচনা করিব।

বিবাহ-সংস্কারে শাস্ত্রীয় আরও দুইটি অনুষ্ঠান আছে, একটি "সপ্তপদীগমন" অপরটি "গুরুবরণ"। সপ্তপদীগমনে বর ও কন্যা একত্রে সপ্তপদ অগ্রসর হইতে হয়। আমরণ সকল কাজে দম্পতি যে পরস্পরের সঙ্গী ও সহায়ক—তাহারই একটা আনুষ্ঠানিক রূপ সপ্তপদী-গমন। আর গুরুবরণ সর্ব্বাগ্রে করণীয়,—কেন না, গুরু বা আদর্শই বিবাহ-মিলনের সিমেণ্ট স্বরূপ। আর্য্যধর্ম্মে আদর্শকে সমাজ-জীবনে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্যই বিবাহ ব্যবস্থা।

কেবল দৈহিক প্রয়োজন বা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্য বর্ণাশ্রমী সমাজে বিবাহের চরম লক্ষ্য ছিল না ; হিন্দুধর্ম্ম পরিপূর্ণ মানব জীবন-যাপনের জন্য বিবাহকে ধর্ম্মের অন্যতম অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে সমাজে স্থান দিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রীয় সংস্কারের মধ্যেও বিবাহকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন !

প্রাচীনকালে আর্য্যভারতে সবর্ণ বিবাহের সহিত অনুলোম অসবর্ণ বিবাহও সমান আদরণীয় ছিল। ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কন্যা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কন্যা গ্রহণীয়। আবার, বৈশ্যের বেলায় বিপ্র, ক্ষত্রিয় ব্যতীত পৃথিবীর যে-কোন জাতির কন্যা অনুলোমক্রমে গ্রহণীয় ছিল। উচ্চবর্ণের পুরুষ যদি তদপেক্ষা নিম্নবর্ণের নারীর সহিত বিবাহসূত্রে মিলিত হয় তাহাকেই অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ বলে। অবশ্য, বিপ্রের সহিত শূদ্র কন্যার বিবাহ যদিও শাস্ত্রসম্মত তথাপি প্রশংসনীয় নহে। কারণ, এই প্রকার বিবাহে স্ত্রী-পুরুষের মানসিক উৎকর্ষের ব্যবধান খুব বেশী হওয়াতে স্ত্রী স্বামীকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না। তাই সন্তান-

সন্ততিও প্রায়ই উৎকৃষ্ট হইতে পারে না।

উচ্চবর্ণের প্রতি নিম্নবর্ণের সাধারণতঃ একটা সহজ শ্রদ্ধা থাকেই। তাহা ছাড়া, মেয়েরা যদি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কোন উচ্চ বর্ণের পুরুষকে বরণ করে, তাহা হইলে তখন তাহাদের সে-শ্রদ্ধা যে কতখানি প্রবল হইয়া ওঠে তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। যদি উচ্চবর্ণের পুরুষ শ্রদ্ধাসহকারে আত্ম-সমর্পিতা কোন নিম্নবর্ণের স্ত্রীর সহিত শাস্ত্রসম্মতভাবে পরিণীত হয়, তবে তাহাদের সন্ততি স্বভাবতঃই সুস্থ ও সবল দেহ এবং উচ্চবর্ণানুরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

"যাদৃগ্ গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥"

—মনুসংহিতা।

অর্থাৎ, নদী যেমন সাগর-সংযুক্ত হইয়া লবণাক্ত হইয়া থাকে, তেমনি নারী-জাতিও যে-প্রকার সাধু বা অসাধু ব্যক্তির সহিত বিবাহসূত্রে মিলিত হয় সেই প্রকার গুণবিশিষ্টা হইয়া থাকে। বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী ও মন্দপাল-পত্নী শারঙ্গী ইহার অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যদিও ইহারা উভয়েই শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি উৎকৃষ্ট পতিলাভ করিয়া নিজের উৎকর্ষের বলে জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। উন্নতি কথার মানেই ঊর্দ্ধে আনতি। এবং এই উচ্চের প্রতি আনতি অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও তদনুসরণ প্রবৃত্তি হইতেই মানুষ নিজে ধীরে-ধীরে উন্নত হইয়া ওঠে। এই নিয়ম স্ত্রী-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু এখানে আমরা কেবল নারীর কথাই আলোচনা করিব। শ্রদ্ধা,

অনুসন্ধিৎসা ও সেবার দ্বারা নারী উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়। সেই উর্ব্বর ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজের সহযোগে নারী উত্তম ফল প্রসব করিতে সক্ষম হয়। আর, উত্তম বীজ পাইতে হইলে উৎকৃষ্ট বংশের—উচ্চ বর্ণের প্রয়োজন। এইখানেই বংশানুক্রমিকতা অর্থাৎ Law of Heredity আসিয়া পড়ে। আজকাল অনেকে মনে করিতেছেন যে পুরুষ যে-বর্ণের বা যে-বংশেরই হউক না কেন শিক্ষিত, অর্থবান্, স্বাস্থ্যবান্ ও চরিত্রবান্ হইলেই সে বিবাহে গ্রহণযোগ্য। ইহা যে কতদূর মূর্খতার পরিচায়ক এবং সমাজ ও জাতির পক্ষে ইহা যে কতখানি ধ্বংসাত্মক তাহা প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন। কারণ, বৈজ্ঞানিকগণ বহু গবেষণার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে মানুষের এক পুরুষের উপার্জ্জিত গুণরাজী (অর্থাৎ acquired qualifications) তাহার রক্তে কোনক্রমেই সংক্রামিত হইতে পারে না। ক্রমান্বয়ে পাঁচ-সাত পুরুষ যদি একই গুণের অধিকারী হইতে থাকে, তবে সেই গুণ তাহাদের বংশগত অর্থাৎ তাহাদের রক্তের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বহু দেখা যায় কোন বংশের সন্তান অতি শিশুকালেই উৎকৃষ্ট গান গাহিতেছে; খোঁজ করিলেই দেখা যাইবে, তাহার বাপ, পিতামহ প্রভৃতি প্রত্যেকেই কম-বেশী গায়ক। এই নিয়ম আমরা পশু, পাখী এমন কি উদ্ভিদের বেলায়ও দেখিতে পাই। কি পাশ্চাত্য দেশে, কি আমাদের দেশে আমরা সকলেই ঘোড়া, গরু কিংবা কুকুর কিনিবার সময় তাহাদের বংশ দেখিয়া ক্রয় করি। সুতরাং এই বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর দাঁড়াইয়াই ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ বর্ণাশ্রমের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন; যাহাতে বংশ পরম্পরায়

একই গুণ ও কর্ম্মের অনুশীলনে জাতি অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

"বিবাহ ব্যাপারে পাত্র ও পাত্রীর উৎকর্ষ অপেক্ষা বংশ, বর্ণ ও জাতিগত বিচার ও বিবেচনা কম প্রয়োজনীয় নহে—বরং বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র উভয়েরই মতে অধিকতর প্রয়োজনীয় ও একান্ত আবশ্যক।"
—শ্রীশ্রীঠাকুর।

"Heredity is an acquired fact—an experimental truth."
—Maurice Materlink.

তাই, সুপ্রজননের দিক দিয়া অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ তুচ্ছ তো নয়ই বরং অনুকূল অবস্থা হইলে প্রত্যেক সমাজের ইহা আগ্রহের সহিত গ্রহণীয়। আর, সমাজের দিক দিয়া এই প্রকার বিবাহে প্রত্যেক বর্ণের সহিত প্রত্যেক বর্ণের একটা স্বাভাবিক সৌহার্দ্দ্য ও আত্মীয়তা গড়িয়া ওঠে। ইহাতে জাতি যে কতটা জমাট ভাবাপন্ন ও শক্তিশালী হইয়া ওঠে তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন। আর, এই তিন বর্ণই আর্য্যদ্বিজ। ইহাদের অন্ন, জল যদি উপযুক্ত শুচিতা ও আগ্রহের সহিত উৎসর্গীকৃত হয় তবে প্রত্যেক বর্ণই অপর বর্ণের অন্ন ও জল আদরের সহিত গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাই শাস্ত্রের বিধান। আর, এইরূপ উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্নের সহিত অপেক্ষাকৃত নিম্নের মিলনে,—যদি এই মিলন শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়—নিম্ন ধীরে-ধীরে উচ্চের দিকে গমন করিতে থাকে, আর উচ্চও আরোতর উচ্চের দিকে পরিণতি লাভ করিতে থাকে। ইহাদের সন্তান-সন্ততিও পিতৃবর্ণেরই হইয়া থাকে।

কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রী যদি নিকৃষ্ট পুরুষকে পতিত্বে বরণ করে তবে বলিষ্ঠদেহ কিন্তু দুর্ব্বল স্নায়ু ও ক্ষীণ মস্তিষ্ক সন্ততি জন্মগ্রহণ করে।

"প্রতিলোমাসু স্ত্রীষু চোৎপন্নাশ্চাভাগী নঃ।"

—বিষ্ণুসংহিতা।

আবার, সগোত্র বিবাহও হিন্দু শাস্ত্রকারেরা নিন্দনীয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্ত্রী সগোত্রা হইলে তুল্য অথচ বিপরীত-ধর্ম্মী হয় না। একটা আর একটাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। বিবাহ-মিলনে একজন অপর জনের অন্তর্নিহিত শক্তির ধারক ও পোষক হয় না।

"Marriage between blood relations is apt to accentuate the weakness in the family."

—Herschfeld V.

সগোত্র বিবাহ হইলে প্রায়ই বিকলাঙ্গ, ক্ষীণজীবী ও অল্পায়ু সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাই, রক্ত-সম্বন্ধে দূরত্ব কথঞ্চিৎ বেশী হওয়া আবশ্যক—তাহাতে মিলন পূর্ণতর ও মঙ্গলপ্রসূ হয়।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী প্রভৃতি সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যদেশের আইনেও সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ।

The Act of 1835 states —"All marriages between persons within the prohibited degrees of consanguinity and affinity shall be absolutely null and void to all intents and purposes."

নারীর বাল্য-বিবাহ

কাহারও শুভাশুভ নির্ণয় করিতে গেলে প্রথমে দেখা প্রয়োজন তাহার আন্তরিক চাহিদা কি, অর্থাৎ তাহার সহজাত সংস্কার কোন্ দিকে—কি পাইলে সে শারীরিক ও মানসিক পুষ্টি লাভ করিয়া ক্রম-বর্দ্ধনার দিকে অবাধ গতিতে চলিতে পারে। এইগুলি বিচার করিয়া, যে পথ অবলম্বনে সে অনায়াসেই তাহার স্বাভাবিক পরিণতিতে গিয়া পৌঁছিতে পারিবে তাহাই তাহার প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট মঙ্গলের পথ এবং সেই পথই তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত করিতে হইবে—কেননা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ কোন প্রকারেই প্রাণদ হইতে পারে না—ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য।

সুতরাং, নারী-জাতীর প্রকৃত কল্যাণ, শান্তি, তৃপ্তি ও সার্থকতার পথ যদি আমাদের নির্দ্দেশ করিতেই হয়, সর্ব্বপ্রথমেই তাহাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। তাহাদের শারীরিক পরিণতি কি প্রকার, তাহাদের আন্তরিক চাহিদারই বা রূপ কি—ইহাই সুচিন্তিতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া নারী-জাতির প্রকৃত কল্যাণের পথ নির্দ্ধারণ করিতে যত্নবান হওয়া উচিত।

এখন আমরা বিচার করিয়া দেখিব নারীর বাল্য-বিবাহ তাহাদের জীবনে সার্থকতা, তৃপ্তি ও সুখ আনয়ন করে, না ইহা তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনে বিপর্য্যয় ও বিধ্বস্তিকে আমন্ত্রণ করে? নারীর প্রকৃতি বুঝিবার জন্য জীব-জগতের স্ত্রী-জীবের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যাইতে পারে। জীবমাত্রেই জীবন রক্ষার্থে আহার চায়

ও বংশ রক্ষার্থে শাবক উৎপাদন করে—এই ব্যবস্থার উপরই সৃষ্টিরক্ষা নির্ভর করে। অতএব আহার ও প্রজনন করার আকূতি জীব মাত্রেরই স্বাভাবিক চাহিদা। যে নিয়ম ও শৃঙ্খলায় জীব-জগতের এই আদিম ও স্বাভাবিক চাহিদার সুষ্ঠু, মঙ্গলপ্রসূ ও সুনিয়ন্ত্রিত সমাধান আছে তাহাই আদর্শ নিয়ম বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। আমরা দেখিতে পাই স্ত্রীজাতি মাতা হয়—সন্তানকে পালন-পোষণ করে, সন্তান বা পরকে কষ্ট করিয়াও পালনে-পোষণে বাড়াইয়া তুলিয়া সুখানুভূতি প্রথমে জাগে স্ত্রীজাতির মাতৃত্বে। স্ত্রী-জীব মাত্রেই যখন মাতা হয়—মাতৃত্বে সুখবোধ করে, তখন নারীদিগেরও মাতা হইবার প্রকৃতিগত প্রেরণা আছে—মাতৃত্বের ক্ষুধা আছে। তাহা হইলে মনুষ্য-সমাজের উচিত তাহাদিগকে মাতা হইবার সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দেওয়া—মাতা হইতে হইলে যাহাতে তাহাদের কোন কষ্ট না হয় সেইরূপ বিধান করা। তাহাই হইবে নারীদিগের প্রকৃত মঙ্গল বিধান।

নারীদেহ পুরুষদেহ হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। নারীদিগের মাতৃত্বের উপযোগী অনেকগুলি অঙ্গ আছে। সেইগুলি নারীদেহের মুখ্য অঙ্গের মধ্যে গণ্য। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে মাতৃত্বের পরিপোষক অঙ্গগুলি সক্রিয় হয়। নারীচিত্তে তখন মাতৃত্বের ক্ষুধা জাগে। তখন যদি সেই অঙ্গগুলি ব্যবহৃত হইতে না পায় অর্থাৎ মাতৃত্বের ক্ষুধার আহার যদি তখন না মিলে তখন সেই অঙ্গগুলি ও তৎসংশ্লিষ্ট স্নায়ু ও রসগ্রন্থিগুলি ক্রমে ক্রমে শুষ্ক ও বিকৃত হইয়া যায় এবং তজ্জন্য বহু ব্যাধি জন্মে। ইহা অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ স্বীকার করেন। বিখ্যাত মনীষী Havelock Ellis এই মাতৃত্বের সুখবোধকে—massive and

sustained physiological joy বলিয়াছেন। সুতরাং, নারী মাতা হইবার উপযুক্ত হইলে মাতা হইতে না পাওয়া তাহাদের মুখ্য অভাব। সে-অভাব পূরণ করিতে না দিলে তাহাদের জীবন বিকৃত হয় এবং পরোক্ষতঃ তাহাদের প্রতি নির্য্যাতন করা হয়। সুতরাং, মাতৃত্বের অঙ্গগুলি কার্য্যক্ষম হইলেই অর্থাৎ নারীচিত্তে মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইবার পূর্ব্বাহ্ণেই তাহাদের মাতা হইতে পারার সুব্যবস্থা সমাজের পক্ষে অবশ্য করণীয়,—কেননা, তাহা নারীগণ ও মনুষ্য-সমাজ উভয়ের পক্ষেই কল্যাণজনক।

শরীরবিজ্ঞানবিদ্ বিশিষ্ট মনীষীগণ বলেন যে গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে নারীদেহে সাধারণতঃ বারবৎসর বয়সে মাতৃত্বের পরিপোষণী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-গুলি ক্রিয়াশীল হইতে আরম্ভ করে এবং পনের বৎসর হইতে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণ ক্রিয়াশীল থাকিয়া পঁয়তাল্লিশ বৎসরের পর নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। অবশ্য, এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়—কিন্তু সে কদাচিৎ। সুতরাং, বালিকারা যাহাতে বার হইতে চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে মাতা হইবার সুযোগ পায় তেমনতর ব্যবস্থাই তাহাদিগের পক্ষে বিধিনির্দ্দিষ্ট কল্যাণজনক পন্থা। তাই আমাদের সত্যদ্রষ্টা আর্য্যঋষিগণ সমাজে বাল্য-বিবাহ (শিশু বিবাহ নহে) প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, স্ত্রী-জন্তুগণ মাতৃ-ত্বের উপযোগী হইলেই পুংজন্তুগণ তাহাদিগকে অনুসরণ করে এবং এই ভাবেই সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার বিচিত্র প্রয়োজন পরিপূরিত হইতে থাকে। উদ্ভিদ জগতেও পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলেই মক্ষিকাগণ পুংপুষ্প হইতে স্ত্রীপুষ্পে রেণু বহন করিয়া লইয়া যায় আর তখনই ঘটে ফলের

সম্ভাবনা। ইহাই প্রকৃতির বিধান। মনুষ্য-সমাজেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু পশুজগৎ পরিচালিত হয় তাহাদের সহজাত সংস্কার দ্বারা, আর মনুষ্য-সমাজ চলে স্বীয় স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা। তাই, সংসারানভিজ্ঞা তরুণীগণ যাহাতে কোন বিকৃতিবুদ্ধি পুরুষ দ্বারা প্ররোচিত হইয়া বিপথগামিনী না হয় সে-বিষয়ে সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই লক্ষ্য থাকা বিধেয়।

সুতরাং মাতৃত্বের লক্ষণগুলি পূর্ণভাবে পরিপুষ্ট হইবার পূর্ব্বে তরুণীগণকে পাত্রস্থা করিলে তাহাদিগের প্রতারিত হইয়া অশেষ দুর্গতি ভোগ হইতে রক্ষা করা অনেক সহজ। অবশ্য, তরুণীগণ যদি পিতৃগৃহে উপযুক্তরূপে শিক্ষিতা হইবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে তাহারা সাধারণতঃ বিপথগামিনী হইবে না। অন্যথায় নারীর বাল্য-বিবাহ তাহাকে অনেক দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা করে।

সন্তান-প্রতিপালনের দায়িত্ব পিতামাতা উভয়েরই। কিন্তু বিবাহ ব্যতীত সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব পুরুষে বর্ত্তায় না। পুরুষ বিবাহের মধ্য-দিয়াই স্ত্রী ও অপত্য প্রতিপালনের ভার লইবার প্রতিশ্রুতি দান করে। বিবাহ কথার মানে—বি (বিশিষ্টরূপে, অর্থাৎ যার যার নিজস্ব রকমে) + বহ্-ধাতু হইতে। বহ্-ধাতুর মানে বহন করা—জীবন ও বৃদ্ধির দিকে। নারী চায় পুরুষকে সম্বর্দ্ধনা করিতে, আর পুরুষ চায় নারীর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইতে। নর-নারীর এই সহজাত প্রবৃত্তির সহজ সমাধানই বিবাহ। পরস্পরকে নিজস্ব রকমে জীবনবৃদ্ধির দিকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার নামই বিবাহ। বিবাহের অন্য উদ্দেশ্য—নারীদিগকে একা সন্তান প্রতিপালন করিতে

হইলে যে কষ্ট ভোগ করিতে হয়—তাহা হইতে মুক্তিদান। তাই নারী-সমাজের মঙ্গলের জন্য—তাহাদিগকে বহুবিধ দুর্ভোগ হইতে রক্ষার নিমিত্তই বিবাহ মানব-সমাজে অবশ্য কর্ত্তব্য। আর, এই বিবাহ নারীর উপযুক্ত বয়সে অর্থাৎ সাধারণতঃ বার হইতে চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয়তঃ, নারীদিগের অল্প বয়সে বিবাহ হইলে কুমারী হৃদয়ের কলুষলেশহীন প্রথম পবিত্র প্রেম স্বামীর উপর ন্যস্ত হইবার সুযোগ পায়। কারণ, নারীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম—সহজাত-সংস্কারই হইতেছে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা পাওয়ার ও প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারার আকাঙ্ক্ষা—"Love is woman's whole existence"—তাই উপযুক্ত বয়সে ভালবাসিবার ক্ষুধা হৃদয়ে জাগরূক হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই যদি তাহারা উপযুক্ত পাত্র সম্মুখে পায়, তাহাদের প্রকৃতি-প্রদত্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সেইখানেই বিশ্রাম লাভ করিয়া জীবনকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করিয়া তুলিতে সক্ষম হয়। পিতামাতার সাথে সন্তানের সম্বন্ধ যেমন সহজ ও স্বাভাবিক, কোন প্রকার রূপ বা গুণের অপেক্ষা মাত্র রাখে না, অল্প বয়সে বিবাহ হইলে দম্পতি তদ্রূপই পরস্পরের সম্বন্ধ বিধির নির্ব্বন্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়া পরস্পরের দোষত্রুটি সহজেই স্বীকার করিয়া লইতে পারে। দুইজনে একত্রে একই পরিবারে এক রকম পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হওয়ার দরুণ পরস্পরের প্রতি সহজ মমত্ববোধও জাগরিত হইবার সুযোগ পায়। পত্নী তাহার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যানুসারেই অনেকাংশে পতির মনোবৃত্ত্যনুসারিণীরূপে নিজেকে গড়িয়া লইতে সমর্থ হয়। আর, বিবাহও তাই সচরাচর

সুখশান্তিপ্রদ ও কল্যাণকারী হয়। সেইজন্যই আর্য্যভারতে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের কখনও প্রয়োজন হয় নাই। এদেশের মেয়েরা একই স্বামীকে জন্মজন্মান্তরের স্বামীরূপে কামনা করিতে সক্ষম হইয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ তাহারা জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ বলিয়া সহজভাবে মানিয়া লইতে অভ্যস্ত।

চতুর্থতঃ, বাল্য বয়সে মেয়েদের মনোবৃত্তি খুবই কোমল থাকে। তাহাদের চরিত্রও সহজ নমনীয় হয়। তখন তাহাদের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাহাদিগকে যেরূপে ইচ্ছা তখন সংসার-উপযোগী করিয়া গড়িয়া লওয়া যায়। সেই সময় যদি তাহারা বিবাহিতা হইয়া শ্বশুরালয়ে গমন করে, সংসারাভিজ্ঞা শ্বশ্রূ বা অন্য কোন বয়োজ্যেষ্ঠা গৃহকর্ত্রীর কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া তাহারাও গৃহস্থালীতে দক্ষতা ও পটুত্ব লাভ করে। সংযম, মিতব্যয়িতা, সেবা, শুশ্রূষা, সন্তান-পালন ইত্যাদি নারীজীবনের অপরিহার্য্য ও অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সম্যক্ শিক্ষালাভ করিয়া ভবিষ্যতে সুগৃহিনী ও সুমাতা হইবার অমূল্য সুযোগ লাভ করিতে পারে। নারীর সুগৃহিনী ও সুমাতা হইবার শিক্ষার উপর নির্ভর করে জাতির ভবিষ্যৎ। কেন না, যে-শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ তাহাদের প্রকৃত শিক্ষার স্বস্তিবচন হয় মায়ের হাতেই।—"The mother is the child's supreme parent" (Sex and Society—Ellis). বিবাহ নারীর শ্রেষ্ঠ সংস্কার। বিবাহ দ্বারা নারী গোত্রান্তরিতা হয়। গোত্রান্তরিত হওয়া মানেই বিবাহের পর হইতে নারী তাহার শ্বশুরকুলের কৃষ্টি ও রক্তের ধারা বহন করিয়া তাহার সন্তানে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

স্বামীর বংশের কৃষ্টি ও আচার-ব্যবহার যদি তাহার চরিত্রকে তদনুরূপভাবে গঠন করিতে না পারে—তবে তাহার ভিতর-দিয়া তাহার স্বামীর বংশের ধারা অব্যাহত থাকিবে কি প্রকারে? মানুষ তাহার সন্তান-সন্ততির মধ্য-দিয়াই বাঁচিয়া থাকে। এই বাঁচার—এই বংশের ধারা অব্যাহত রাখার দায়িত্ব নারীর।

অনেকে যৌবন-বিবাহের পক্ষপাতী। যৌবন-বিবাহের প্রথম দোষ যে, বাল্যে নারীর মাতৃত্ব-পরিপোষণী অঙ্গগুলি যখন পুষ্ট হইয়া ওঠে তখন উপযুক্ত ব্যবহারের অভাবে সেগুলি বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহা ছাড়াও এ বিবাহের আর একটি মারাত্মক দোষ আছে যাহাতে কেবলমাত্র নারীর নয় সমস্ত জাতির সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। নারী যৌবনে উপনীত হইবার বহু পূর্ব্বেই অর্থাৎ বালিকাবস্থায় (১২—১৪ বৎসর) তাহার মনে ভালবাসার প্রথম প্রশ্ন জাগে, তখন হইতে বহুদিন ধরিয়া ভালবাসার পাত্রটির জন্য অপেক্ষা করিতে হইলে তাহার মনে নানা পুরুষের ছাপ পড়িতে পারে—কাহাকেও হয়তো স্বামীভাবে কল্পনা করিতে পারে, কাহারও সাথে প্রীতির সাথে মেলামেশা করিতে পারে—পরিণামে হয়তো সেই সকল পুরুষের সাথে বিবাহ না হইয়া অন্যত্র তাহার বিবাহ হইল। কিন্তু এই মেলামেশার ফলে নারীর মস্তিষ্কে যে ছাপ পড়ে তাহাতে তাহার সহজ নমনীয় চরিত্র রঞ্জিত হইয়া যায়, পরে অন্য পুরুষের সহিত তাহার মিলন হইলে তাহার মস্তিষ্কে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, চরিত্রে যে অনমনীয় কাঠিন্যের প্রকাশ পায় তাহাতে তাহাদের দাম্পত্য জীবন তো দুর্ব্বিসহ হয়ই, পরন্তু সেই দ্বন্দ্বপূর্ণ, শ্রদ্ধাশূন্য, প্রেমবিহীন মনোভাব

হইতে যে-সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহারাও প্রায়শঃই দুর্ব্বল, ইন্দ্রিয়-পরবশ ও অল্পায়ু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে দুর্ব্বল জাতির উদ্ভব হয়। সুতরাং বাল্যকালে যখন মনোবৃত্তি সকল কোমল ও সহজ নমনীয় থাকে তখনই সুশিক্ষার দ্বারা মানুষ নিজেকে গড়িয়া লইবার সুযোগ পায়। বাল্যবিবাহ মানে আমি শিশু-বিবাহ ধরিতেছি না। নারী তখনই বিবাহযোগ্যা হয় যখন হইতে তাহার শারীরিক ও মানসিক যৌবনারম্ভ সূচিত হয় অর্থাৎ সাধারণতঃ বার হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সই তাহার বিবাহযোগ্য বয়স।

বাল্যবিবাহে অভিভাবকের দায়িত্ব জ্ঞান একটি খুব বড় কথা। যৌবন-বিবাহের শুভাশুভ যেমন অনেকাংশে পাত্র-পাত্রীর বুদ্ধি, বিবেচনা ও মনোনয়ন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, বাল্যবিবাহের মঙ্গলামঙ্গল প্রধানতঃ নির্ভর করে অভিভাবকের সুশিক্ষা ও সুষ্ঠু মনোনয়ন ক্ষমতার উপর। উভয় বংশের কৃষ্টি ও ভাবধারার সহিত সম্যক পরিচিত পাত্র-পাত্রীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, তাহাদের দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ ইত্যাদি সম্যকরূপে বিচার করিয়া তবেই বিবাহ সংঘটন করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে অভিভাবকের বহুদর্শী অভিজ্ঞতাই তাহাকে প্রায়শঃই ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম। সুতরাং এ বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে হইলে সামাজিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে কতখানি উন্নতি হওয়া দরকার তাহা সহজেই অনুমেয়।

বহু বিবাহ

দেশ চায় মানুষ। মনুষ্যত্বই জাতীয় জীবনে পরম সম্পদ—যুগে-যুগে, কালে-কালে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বসমাজে মনুষ্যত্বের আরাধনাই চলিয়া আসিতেছে। মনুষ্যত্বের আধার নররূপী দেবতাই সর্ব্বকালের জনগণের পথপ্রদর্শক। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহামানবগণ যুগে-যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া তদানীন্তন জাতীয় জীবনের কলুষ-কালিমা বিদূরিত করিয়া জগতে সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু মহামানব শিক্ষার দ্বারা তৈয়ারী করা যায় না, তাঁহারা জন্মান। তাঁহাদের জন্ম নির্ভর করে উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পরিবেশের উপর। আজ ভারতের জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণ। তাহার ধর্ম্ম, তাহার কৃষ্টি, তাহার জীবন আজ বিপন্ন। আজ ভারত চায় এমন কর্ণ-ধার, এমন পথপ্রদর্শক যে তাহাকে সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ করিয়া তাহার ধর্ম্ম, তাহার কৃষ্টি, তাহার জীবন রক্ষা করিবার উপযোগী সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ দিতে পারেন। আজ আমাদের চাই শিবাজীর মত ছেলে, নরেন্দ্রনাথ অর্থাৎ বিবেকানন্দের ন্যায় ছেলে; কিন্তু সেজন্য চাই উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈয়ারী করা, উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করা। মানুষ হইবার সর্ব্বপ্রথম আমাদের প্রয়োজন nature and nurture অর্থাৎ স্বভাব ও শিক্ষা। আমাদের স্বভাব তদনুরূপ ভাবেই আত্মপ্রকাশ করে—আমরা যেমনতর instinct অর্থাৎ

সহজাত সংস্কারের অধিকারী হই। এই instinct-ই হচ্ছে প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্বের বনিয়াদ। Instinct যাহার যত কৃষ্টি-সমৃদ্ধ, আর উত্তর-জীবনে যে যেমনতর আপন instinct-পরিপোষণী শিক্ষা লাভে সমর্থ হয়, সে তেমনতর মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। Instinct আমরা লাভ করি আমাদের পিতৃপুরুষ হইতে। ইহাকেই চলতি কথায় বলে বংশের ধারা। যদি উৎকৃষ্ট অর্থাৎ উচ্চ সংস্কৃতি-সম্পন্ন বীজ তদুপযুক্ত ক্ষেত্রে রোপিত হয়, তবেই উৎকৃষ্ট ফসলের আশা করা যাইতে পারে। তাহার পরে আসে শিক্ষার প্রশ্ন। কিন্তু সর্ব্বপ্রথম আমাদের প্রয়োজন উৎকৃষ্ট বীজ ও অনুকূল ক্ষেত্র। বীজের অন্তর্নিহিত গুণাবলীই সন্তান-সন্ততির স্বভাব-চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে। ইহাই বৈজ্ঞানিক সত্য। Mendel আবিষ্কার করিয়াছেন—কতকগুলি চরিত্রগত লক্ষণ বংশানুক্রমে বরাবর অব্যাহত, অবিকৃত ও অটুটভাবে সন্তান-সন্ততির ভিতরে বিদ্যমান থাকিয়াই যায়। কাজেই বীজ যদি উন্নত সংস্কৃতি-সম্পন্ন হয়, আর তদুপযুক্ত ক্ষেত্রে যদি বিধিমাফিক বপন করা যায় তাহা হইলে দেশ তথা জাতি প্রভূত পরিমাণে উৎকৃষ্ট ফললাভে সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। এই দিক দিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে জাতির এই ঘোর দুর্দ্দিনে উপযুক্ত পুরুষের বহু বিবাহ কেবল প্রশংসার্হই নহে—অবশ্য কর্ত্তব্য। বহু বিবাহের আরও একটি দিক দেখিবার আছে। ধরা যাউক, কোন পুরুষের সর্ব্বতোমুখীন প্রতিভা আছে,—অর্থাৎ শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে, চরিত্রে, বংশে, বর্ণে, বিদ্যায় সর্ব্বদিক হইতে একজন পুরুষ সমাজের শীর্ষস্থানীয়। কোন নারী তাহাকে স্বামীত্বে বরণ করিল। এখন সেই নারী তাহার স্বামীর

চরিত্রের বা শিক্ষার যে অংশের দ্বারা বেশী প্রভাবান্বিতা হইবেন অর্থাৎ স্বামীর যে-গুণকে তিনি সম্যক উপলব্ধি করিয়া তদনুরূপ ভাবে স্বামীকে অনুরঞ্জিত করিতে পারিবেন, তদ্‌গুন বিশিষ্ট সন্তানেরই তিনি জননী হইতে পারিবেন। স্বামীর চরিত্রের অন্যান্য গুণরাশি যাহা তিনি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না সেই সমস্ত গুণসম্পন্ন সন্তানও তিনি লাভ করিতে পারিবেন না। তাই যদি বহুগুণসম্পন্ন পুরুষের বহু স্ত্রী থাকে তবে বিভিন্ন গুণসম্পন্ন বহু সন্তান সমাজ লাভ করিতে সক্ষম হয়।

উদ্ভিদ জগতে আমরা দেখিতে পাই একটি সুমিষ্ট ও উচ্চ জাতের আম্র বৃক্ষের বিভিন্ন শাখার সহিত বহু নিকৃষ্ট জাতের আম্র-চারার জোড় বাঁধিয়া আমরা বহু উৎকৃষ্ট কলমের গাছ সৃষ্টি করিতে পারি। তদ্রূপ মনুষ্য-সমাজেও যদি উপযুক্ত পুরুষের বহু স্ত্রী শাস্ত্রসম্মতভাবে বিদ্যমান থাকেন তাহা হইলে বহু উৎকৃষ্ট সন্তানই আমরা লাভ করিতে পারি। বহু বিবাহের স্বপক্ষে আর একটি বিবেচ্য বিষয় হইল—নারী যে-সময়ের মধ্যে একটি সন্তান প্রসব করিতে সমর্থ হয়—পুরুষ সাধারণতঃ সেই সময়ের মধ্যেই একাধিক সন্তানের জনক হইতে পারে।

"Every egg produced by a woman (usually once a month) carries the same type of sex chromosome". —আবার পুরুষের বেলায় দেখা যায়—"The sperms are released in fantastically large numbers—up to a thousand million." অর্থাৎ, নারীর ডিম্বকোষ সাধারণতঃ প্রতি মাসে একটি করিয়া সুপরিপুষ্ট ডিম্ব প্রদান করিতে সক্ষম, কিন্তু পুরুষ সেই সময়ের মধ্যেই লক্ষ কোটি শুক্রকীট উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং, স্বাস্থ্য-

বান, চরিত্রবান, আদর্শপরায়ণ, বিত্তশালী পুরুষ যদি তদুপযুক্ত একাধিক স্ত্রীতে ধর্ম্মতঃ উপগত হয় তবে বহু উৎকৃষ্ট সন্তানের জন্ম হইতে পারে। এইরূপে দেশ তথা জাতি বহুলাংশে উপকৃত হইয়া থাকে।

জন্ম-মৃত্যুর হার গণনা হইতে দেখা গিয়াছে, পুত্র-সন্তান অপেক্ষা কন্যা-সন্তানের সংখ্যাই অধিক—"Average prenatal mortality, male to female 127·5 to 100." সুতরাং, যেখানে কন্যা-সন্তানের সংখ্যাই অধিক এবং কন্যা যদি সৎ ও উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিবার ইচ্ছাই থাকে তবে যেখানে প্রাকৃতিক নিয়মে স্বইচ্ছায় উপযুক্ত পাত্রে একাধিক স্ত্রী পরিণীতা হয় সেখানে বিরোধিতা না করিয়া সহায়তা ও উৎসাহ বর্দ্ধন করাই সকলের কর্তব্য। কন্যাগণকে সেইরূপ ভাবেই শিক্ষিতা করা উচিত যাহাতে তাহারা উপযুক্ত সৎপাত্র পাইলে সপত্নীকে স্বীকার করিয়া লইয়াও উক্ত পাত্রে সন্তুষ্ট চিত্তে, সাগ্রহে আত্মসমর্পণে উদ্বুদ্ধা হয়। তাহা না হইলে অনেক কুমারীকে হীন পাত্র মনোনয়ন করিতে হইবে অথবা কুমারী-জীবন যাপন করিতেই বাধ্য হইতে হইবে।

নারীর অন্তর্নিহিত ঝোঁক মাতৃত্বে। মাতৃত্বই নারীর পূর্ণ বিকাশ। সে চায় উৎকৃষ্ট সন্তানের জননী হইতে। শারীরিক ও মানসিক গঠনই তাহার মাতৃত্বের উপযোগী। উৎকৃষ্ট সন্তানের জননী হইতে হইলে তাহার শিক্ষা, তাহার সংস্কৃতি এমন হওয়া দরকার, যাহাতে সে স্বভাবতঃই আদর্শপরায়ণ এবং সর্ব্বাংশে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষকে পতিরূপে পাইবার সাধনা করিতে পারে,—আর নারীর সহজাত সংস্কার ও সহজ মাতৃবুদ্ধিই তাহাকে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ পুরুষকে পতিরূপে বরণ করিবার

প্রেরণা দেয়। তাই বার্ণার্ড শ' বলিয়াছেন—"নারীর সহজ মাতৃবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ পুরুষের দশমাংশকে বরং শ্রেয় জ্ঞান করে—তৃতীয় শ্রেণীর এক-জন নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে পুরোপুরি পাওয়া অপেক্ষা।" এদিক দিয়া বিবেচনা করিলে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের বহু স্ত্রী হওয়া স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ, "Men are over-sexed, they are by nature polygamous and promiscuous, while women are monogamous." আবার, "A man may love a woman deeply and sincerely and at the same time make love to another woman or have sexual relations with her. It is quite a common thing with a man. It is quite a rare thing with woman."—Dr. William J. Robins. কাজেই নারীর সহজ সংস্কারই হইতেছে একজনকে স্বামীরূপে গ্রহণ করা,—আর পুরুষের বহুবিবাহ স্বাভাবিক।

আবার, "Man's love is of man's life a thing apart. 'Tis woman's whole existence."—অর্থাৎ, পুরুষের নারীর প্রতি ভালবাসা তাহার জীবন ও সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু নারীর স্বামীর প্রতি ভালবাসাই তাহার অস্তিত্ব। পুরুষ যদি আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকে তবে বহু বিবাহ তাহার কমই ক্ষতি করিতে পারে। সমাজ চায় সুসন্তান। তাই শক্তিমান, যোগ্য পুরুষে সম্যক আকৃষ্টা স্ত্রীগণ প্রায়ই সুসন্তানের জননী হইয়া থাকে।

লোক-তথ্য গণনায় দেখা গিয়াছে, বর্ত্তমান সমাজে যাহারা যত অযোগ্য ও দুর্ব্বলচিত্ত তাহাদের সন্তান সুস্থদেহ ব্যক্তির সন্তানের চেয়ে

শতকরা ৫০ হিসাবে বেশী। দুর্ব্বলচিত্ততা পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত দোষ। গ্যালটন প্রতিষ্ঠিত এই সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের লক্ষ্যই হইতেছে, সমাজ হইতে এই দোষের নিরাকরণ এবং যাহারা শরীর-মনের দিক দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ ও সক্ষম তাহাদের মধ্য হইতেই সন্তান জন্মান।

তাই আর্য্য ঋষিগণ সমাজের দিকে চাহিয়া যোগ্য পুরুষের বহু বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন, কেননা বহু বিবাহ দ্বারা সমাজের একটি মহৎ উপকার সাধিত হয় যে উৎকৃষ্ট কুমারীগণ স্বভাবতঃই শ্রেষ্ঠ পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিবে। তাই সমাজের ভিতর যাহারা নিকৃষ্ট পুরুষ তাহারা উৎকৃষ্ট স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে না। ফলে আর্য্য সমাজ-দেহই পুষ্টি লাভ করিবে; এবং যাহারা উৎকৃষ্ট নয়—তাহারা উৎকৃষ্টের পূজক হইয়া উৎকর্ষ লাভ করিবে। কারণ, পুরুষ চায়—নারীর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইতে। উৎকৃষ্ট নারীর দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইতে হইলে তাহাকেও উৎকৃষ্ট হইতে হইবে। আর, সমাজে যাহারা দুর্ব্বল ও অযোগ্য পুরুষ, যথাসম্ভব তাহাদের বংশবৃদ্ধি নিবারিত হইবে। ইহাতে সমাজের প্রভূত মঙ্গলই সাধিত হইবে।

পুরুষত্বের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অবমাননা হইতেছে নারীকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব দেওয়া—কিন্তু নারী যদি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সশ্রদ্ধ আকূতিতে কোন পুরুষকে পতিত্বে বরণ করে—আর সেই নারী যদি বর্ণে, বংশে ও চরিত্রে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে সেই পুরুষের গ্রহণীয়া হয়, তবে সেই নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করাই পুরুষের ধর্ম্ম। সর্ব্বপ্রকারে গ্রহণযোগ্যা হইলেও যদি গ্রহণ করা না হয়, তবে নারী প্রায়শঃই উচ্ছৃঙ্খল, বিকৃত ও সমাজঘাতিনী হইয়া থাকে—আর ঐ পুরুষই হয়

ইহার জন্য দায়ী। অতএব এরূপ করা পুরুষের পক্ষে অধর্ম্ম।

আর, নারী যদি স্বেচ্ছায় সর্ব্বতোভাবে যোগ্যতা বিচার করিয়া কোন পুরুষকে পতিত্বে বরণ করে, আর সে যদি ঐ পুরুষের দশ-মাংশের একাংশেরও অধিকারিণী হয়, তবুও সে নিজেকে সৌভাগ্যবতী বলিয়াই জ্ঞান করে। কারণ, স্বামী কথার অর্থ—'আমার অস্তিত্ব'।

স্বামী—স্ব (Self আত্মা) + আমিন্ (অস্ত্যর্থে)। সুতরাং কোন মেয়ে যদি কোন পুরুষকে স্বেচ্ছায় নিজের অস্তিত্বরূপেই গ্রহণ করে, আর তার সেই গ্রহণ করার মধ্যে যদি কোন ফাঁক না থাকে তবে সেই অস্তিত্বকে সে নিজ ক্ষমতানুযায়ী বাঁচা ও বাড়ার পথেই পরিচালিত করিবে,—ইহাই নারীর বৈশিষ্ট্য।

"নারী হইবে চিরসহনশীলা, চিরশুচী ও কল্যাণী—তার প্রজ্ঞা কখন ভুল করিতে জানে না—সহজ সংস্কারের মতই তা'। নারীর প্রজ্ঞা স্বার্থসাধনের জন্য নয়—ত্যাগের জন্য, তাঁর প্রজ্ঞা তাঁ'কে কখন স্বামীর উর্দ্ধে নিতে চায় না—স্বামীর পার্শ্বচারিণী সহধর্ম্মিণী করিতে চায়। নারীর প্রজ্ঞায় উগ্র স্বার্থান্ধ কামের সংকীর্ণতা নাই, আছে অসীম বৈচিত্র্যময়, অনুরাগভরা বিনয় ও সেবা-নম্রতা—নারীর পরিবর্ত্তনশীলতা ও বৈচিত্র্যের স্বরূপই এই।" —রাস্কিন।

নারীর স্বরূপ এই। নারীর এই রূপ যেখানে বিকৃত হয় নাই—নারী যেখানে প্রকৃত শিক্ষিতা, নারী যেখানে ভালবাসার আধার-স্বরূপা, অর্থাৎ কামনাহীন ভালবাসাই যেখানে নারীর ধর্ম্ম—সেরূপ স্থলে আর্দশপরায়ণ যোগ্য পুরুষের বহু স্ত্রী থাকিলেও তাহাদের ভিতরে বিরোধ বা অশান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা কম থাকে। কারণ,

সতী নারীর বৈশিষ্ট্যই হইতেছে স্বামীকে অস্তিরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে সর্ব্বতোভাবে অব্যাহত রাখা। এরূপ ক্ষেত্রে সমস্বার্থসম্পন্না সপত্নী তাহার বিরাগভাগিনী না হইয়া সন্তোষদায়িনীই হইয়া থাকে। কারণ, উভয়েরই লক্ষ্য বস্তু এক এবং তাঁরই জীবন ও বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের গতিপথ সুনিয়ন্ত্রিত। আর, স্বামী যাহাদের স্বার্থের ক্রীড়নক, খেয়াল-ক্ষুধা পরিতৃপ্তির যন্ত্রমাত্র—ভাগীদার হইলে তাহাদের ঈর্য্যা ও বিদ্বেষের উৎপত্তি হয়ই। কারণ, স্বার্থের ব্যাঘাতেই বিরোধ, আর স্বার্থের পূরণেই মিলন—ইহাই জীবের প্রকৃতি। অন্যথা পতিকে তুষ্ট ও পুষ্ট করাই যাহাদের স্বার্থ, অংশীদারে তাহাদের আনন্দ ও ভালবাসাই স্বাভাবিক। মহাভারত রামায়ণে ইহার অনেক উদাহরণ বিদ্যমান। অবশ্য বহুবিবাহ যোগ্য পুরুষের জন্যই—সকলের জন্য নহে।

কিন্তু যোগ্য পুরুষ আমরা কাহাকে বলিব ? কোন্ পুরুষ বহু-বিবাহের উপযুক্ত ? নারী-জাতির এইরূপ বিবাহে সম্মত হওয়া স্বাভাবিক, অথবা ইহা তাহাদের পক্ষে প্রাণান্তিক শাস্তিস্বরূপ। এই সমস্ত প্রশ্নের উপযুক্ত সমাধানের উপরেই ইহার ঔচিত্য ও অনৌচিত্য নির্ভর করিতেছে। বহুবিবাহ নাম শুনিয়াই আতঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে আজ আর্য্যসমাজ এতই বিভ্রান্ত যে কিসে তাহাদের মঙ্গল, কিসে তাহাদের অমঙ্গল সে চিন্তা করিতেও তাহারা পরাঙ্মুখ।

যাহা আমাদের সমাজের পক্ষে কল্যাণকর, যে-বিধি আমাদের জাতীয় জীবনে মঙ্গলপ্রসূ—যাহা আমাদের সহজাত সংস্কারের ন্যায়

মজ্জাগত, তাহাই আমাদের আর্য্যঋষিগণ আমাদের সমাজে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব—আমাদের কি ছিল আর আমরা কি হারাইতে চলিয়াছি!

এখনও, বহুবিবাহ কোন্-কোন্ ক্ষেত্রে এবং কি-কি অবস্থায় সমর্থনযোগ্য তাহাই আমরা বিচার করিয়া দেখিব। প্রকৃত পুরুষ নামের অধিকারী যিনি তিনি কখনও বিবাহের জন্য লালায়িত হন না। বিবাহ তাহার জীবনে মুখ্য ব্যাপার নহে।

পুরুষ যেখানে আদর্শপরায়ণ—শৌর্য্যে, বীর্য্যে, বংশে চরিত্রে, মনুষ্যত্বে, সামাজিক পরিস্থিতিতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বিদ্যমান—আর নারী যেখানে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সশ্রদ্ধ অন্তঃকরণে, সর্ব্বতো-ভাবে নিজেকে তদুপযুক্ত করিয়া গড়িয়া লইয়া সেই পুরুষত্বের পায়ে দ্বিধাশূন্য চিত্তে নিজের জীবনকে অর্ঘ্য দিয়া ধন্য হয়, কৃতার্থ হয়, বহুবিবাহ সেখানেই সার্থক, আর সেরূপ ক্ষেত্রেই দেশ সুসন্তান আশা করিতে পারে। উন্নত স্ত্রী-পুরুষের মিলনের দ্বারাই দেশ উৎকৃষ্ট সন্তান লাভে সমর্থ হয়।

পুরুষ ছুটিবে তাহার আদর্শের পশ্চাতে—তাহার জাতীয় জীবনের পূর্ব্ব গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে—আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারই প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করাতেই পুরুষের পুরুষত্ব। "Man's power is active, progressive, defensive. He is eminently the doer, the creator, the discoverer, the defender. His intellect is for speculation and invention, his energy for adventure for conquest."—Ruskin.

পুরুষ স্বভাবতঃই গৃহ ও সংসারের প্রতি উদাসীন। পুরুষত্বের সর্ব্বাপেক্ষা বড় নিদর্শন—আদর্শে অনুপ্রাণনা, আর নারী-সাধারণের প্রতি একটি সহজ মাতৃবুদ্ধি। পুরুষত্বের পরম বিকাশ আমরা দেখিতে পাই মারাঠা বীর শিবাজীর চরিত্রে, স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্ত্তমান কালের নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির চরিত্রে। আর, নারীর নারীত্বই তাহাকে অনুপ্রাণিত করে—প্রকৃত পুরুষত্বের পায়ে নতি স্বীকার করিতে। নারী শ্রদ্ধা করে না এমনতর পুরুষকে—যে স্বতঃই নারীর কাছে সহজলভ্য। যে পুরুষকে আরাধনা করিয়া পাইতে হয় অর্থাৎ যে পুরুষ বর্ণে, বংশে, বিদ্যায়, চরিত্রে, বয়সে, সর্ব্বতোভাবে নারী হইতে শ্রেষ্ঠ, নারী স্বভাবতঃ তাহাকেই স্বামীরূপে পাইয়া কৃতার্থ হইতে চায়। এই প্রকার শ্রেষ্ঠ স্বামীর আশ্রয়ে নারীর সকল বৃত্তির বিশ্রাম লাভ ঘটিয়া থাকে। তাই নারীর আদর্শ গিরিরাজ-কন্যা উমা। কত কঠোর তপস্যা করিয়া তিনি মহাযোগী মহেশ্বরকে স্বামীরূপে লাভ করিয়াছিলেন! আর তাহারই ফলে তিনি গণপতি ও কার্ত্তিকের জননী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বহু বিবাহের বিরুদ্ধে কথা উঠিতে পারে—এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মাত্রেই বলিবেন, মানুষ মানুষ, তাহার হৃদয় আছে, তাহার বুদ্ধি আছে, সে ইতর প্রাণীর ন্যায় কেবল আহার পাইলেই এবং প্রজনন করিতে পারিলেই তৃপ্ত থাকে না। মানুষের সকল শক্তি কেবলমাত্র আহার অন্বেষণে ও প্রজনন ক্রিয়াতেই সীমাবদ্ধ নহে। ইহা খুবই সত্য কথা। এ-কথা আমাদের আর্য্য ঋষিগণও জানিতেন। কিন্তু তবুও তাহারা আর্য্য সমাজে বহুবিবাহের প্রচলন ও সমর্থন

কেন করিয়াছিলেন তাহাই আমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত। আজ দেশের বড় দুর্দ্দিন। হিন্দুসমাজ আজ ভাঙ্গিয়া টুকরা-টুকরা হইতে চলিয়াছে। দেশের এই দুর্দ্দিনে, হিন্দু জাতির এই চরম বিপদের মুহূর্ত্তে অধুনা-সভ্য পাশ্চাত্যের অনুকরণ না করিয়া আমাদের গৌরবময় অতীত সভ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদেরই পিতৃপুরুষের বৈজ্ঞানিক উপায়ে লব্ধ বিবিধ সমস্যার সমাধানরাজী কালোপযোগী করিয়া গ্রহণ করা উচিত, আর তাহাই আমাদের বাঁচিবার একমাত্র পথ। মানুষের বুদ্ধি আছে—হৃদয় আছে, তাই মানুষই আত্মত্যাগ করিতে পারে—দেশের স্বার্থের জন্য—দশের স্বার্থের জন্য মানুষই আপনার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিতে সমর্থ। মানুষ যখনই কোন-কিছু মঙ্গল বলিয়া জানে—কল্যাণকর বলিয়া বুঝিতে পারে, আপাত-দৃষ্টিতে তাহা বেদনাদায়ক হইলেও মানুষই তাহা গ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ হয়। ইহা মানুষেরই ধর্ম্ম—পশুর নহে।

বধূ

ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাংভব।
ননন্দারি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥

—বিবাহমন্ত্র, পুরোহিত দর্পণ।

ইহাই হিন্দু বিবাহ মন্ত্রের একটি অংশ। এই প্রকার বহু মন্ত্র অগ্নি ও নারায়ণ সমক্ষে আবৃত্তি করিয়া, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া হিন্দুর বিবাহ সম্পন্ন করিতে হয়। এই সমস্ত নির্দ্দেশ জীবনে যথাযথ পালন করিতে হইলে নারীর উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। এই শিক্ষার কতকাংশ সে কুমারী অবস্থায় পিতৃগৃহ হইতে শিক্ষা করিতে পারে, আর অবশিষ্টাংশ সে বিবাহের পর পতিগৃহে থাকিয়া শিক্ষা করে। সমস্ত সংসারে সম্রাজ্ঞী হইতে হইলে যদি তদনুরূপ শিক্ষা সে না পায়, তবে সে নিজে ও তাহার সমস্ত সংসার ব্যর্থতায় বিধ্বস্ত হইয়া উঠে।

হিন্দু বিবাহের দায়িত্ব শুধু স্বামীর সহিতই সংশ্লিষ্ট নহে। কেবল স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিলেই সেখানে সকল দায়িত্বের পরিসমাপ্তি হয় না। বধূ যিনি আসেন, তিনি সমস্ত সংসারের বধূরূপেই আবির্ভূতা হন। তিনি স্বামীর যেমন বধূ, শ্বশুর-শাশুড়ীরও তেমনি বধূমাতা, আবার দেবর-ননদের তেমনি বৌদিদি। তাই সকলকে বহন করার দায়িত্ব বধূকে লইতে হয়। বধূ যদি সেজন্য পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তুত না থাকেন, তবে তার বধূ নামই ব্যর্থ।

শ্বশুর ও শাশুড়ী স্বামীর জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। তাঁদের সেবা, তাঁদের সন্তুষ্টি বধূ-জীবনের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। স্বামীর

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী, স্বামীর জীবন-বর্দ্ধনে আগ্রহসম্পন্না কোন স্ত্রী তাঁহার জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে কোনপ্রকারে তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা-বিমুখ হইতে পারে না। স্বামীকে অবলম্বন করিয়াই বধূ সংসারে প্রবেশ করেন, স্বামীই বধূ-জীবনের মেরুদণ্ড, তথাপি যাঁহাদের করুণায়, যাঁহাদের প্রসাদস্বরূপ তিনি স্বামী লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্তুষ্টি, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ তাহার বধূ-জীবনের পরম পাথেয়।

তাই, স্বামীরও যদি তাঁহার পিতামাতার প্রতি অনুরক্তির অভাব থাকে, তিনিও যদি পিতামাতার প্রতি সবিশেষ কর্ত্তব্যপরায়ণ না হন—তবুও বধূর সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইবে সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের দ্বারা স্বামীকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার বিচ্যুতি, তাঁহার পাতিত্য হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া, স্বামীর জাগ্রত দেবতা তাঁহার পিতামাতার সেবায় তাঁহাকে নিয়োজিত করা। তাহাতেই স্বামীর প্রকৃত মঙ্গল। শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করিতে গিয়া, সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া যদি স্বামীর প্রতি মনোযোগ একটু কমও হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই; সময়ে তিনি সবই বুঝিতে পারিবেন—আর তাহাতে তিনি মঙ্গলের অধিকারীই হইবেন।

বধূকে আমরা গৃহলক্ষ্মী বলিয়া থাকি। লক্ষ্মী কথার অর্থ শ্রী,—আর শ্রী কথা আসিয়াছে সেবা করা হইতে। শ্বশুরগৃহে আসিয়া বধূ যদি বাক্যে, ব্যবহারে, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যে গৃহের সকলকে খুসী করিতে পারেন, তৃপ্তি দিতে পারেন, তবেই তাঁহার গৃহলক্ষ্মী আখ্যা সার্থক হয়।

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস দেবী চৌধুরাণীতে প্রফুল্লর

চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই—প্রফুল্ল সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—সর্ব্ব শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। ধনে, জনে, জ্ঞানে মহিমান্বিতা হইয়া তিনি দেবী চৌধুরাণী আখ্যায় সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। স্বামী ব্রজেশ্বরও তাঁহার সম্পূর্ণ অনুকূলই ছিলেন। তথাপি তাঁহাকে বধূ-জীবনের কর্ত্তব্য পালনের জন্য শ্বশুর-শাশুড়ী ও সংসারের সেবার জন্য রাণীত্বে জলাঞ্জলি দিয়া, সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিলাইয়া দিয়া পুকুরঘাটে বাসন মাজিতে দেখা গিয়াছিল। আর, তাহাতেই পাইয়াছিলেন তিনি হৃদয়ের পরিপূর্ণ তৃপ্তি. সেখানেই তাঁহার নারীত্ব, তাঁহার বধূত্ব সার্থকতা-মণ্ডিত হইয়াছিল। ইহাই ছিল আমাদের আর্য্য সমাজের বধূ-জীবনের আদর্শ। নারী যাহাকে ভালবাসে,—নারীর যিনি অবলম্বন সেই অবলম্বনের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া শাখা-প্রশাখা পর্য্যন্ত সমস্ত কিছুতেই থাকে তাহার সস্নেহ অনুসন্ধিৎসু সেবাপ্রবণতা। প্রিয়ের যাহা-কিছু প্রিয়, যাহা-কিছু জীবনীয়—সব-কিছুকেই প্রিয়র জীবনের অনুকূল করিয়া সুবিন্যস্ত করিয়া তোলাতেই নারীর তৃপ্তি।

তাহাই নারী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। আর, প্রকৃত ভালবাসার মাপ-কাঠিও তাহাই। তাই পতিব্রতা স্ত্রীর শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবায় সংসারের কর্ত্তব্য পালনে কষ্ট হয় না—হয় তৃপ্তি, হয় আনন্দ—নব নব উপভোগ। মহাভারতে আছে—

> "অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য, ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
> ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য, ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ।"

ভৃ-ধাতুর মানে—ধারণ, ভরণ, পোষণ, পূরণ, দান, প্রাপ্তি ও গ্রহণ।

যে আমাকে ধারণ করিয়া আছে—অর্থাৎ যে আমার অস্তিত্বের অনুকূল, যে আমাকে প্রয়োজনীয় আহার ও পানীয়ের দ্বারা ভরণ করিয়া, পোষণে, বর্দ্ধনে সজীব করিয়া তুলিতেছে, যে সর্ব্বতোভাবে আমার মনোবৃত্ত্যনুসারিণী হইয়া, আমার সকল চাহিদার পরিপূরণ করিতেছে, যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আমাকে দান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে—যে আমাকে পরিপূর্ণভাবে তাহার নিজের অস্তিত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছে—সেই আমার ভার্য্যা। আমাদের এই আর্য্য-ভারতে শুধু শারীরিক উপভোগের দ্বারা ভার্য্যা হওয়া যায় না; এখানে ভার্য্যা, বধূ বা স্ত্রীর সংজ্ঞা বহুবিস্তৃত।

ভার্য্যা এখানে সহধর্ম্মিণী ও অর্দ্ধাঙ্গিনী। চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হ্যস্থাশ্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই গার্হ্যস্থাশ্রমে পুরুষ নারীর হাত ধরিয়া প্রবেশ করিয়া থাকে। সেখানে নারী তাহার প্রেরণা—নারী তাহার কর্ম্মের উৎস। বধূরূপিণী নারী সেখানে সশ্রদ্ধ সহানুভূতিপূর্ণ সেবা লইয়া সংসারের প্রতি কর্ম্মে স্বামীর অনুগমন করে—স্বামীর কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনুপ্রেরণা যোগায়। নারীর পেলব হস্তের স্পর্শে সংসারের সব কঠোরতা ও নীরসতা পুরুষের নিকট সহনীয় ও বহনীয় হইয়া ওঠে—

"ধুয়ে মুছে দাও ধূলির চিহ্ন
জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন-ছিন্ন
সুন্দর কর, সার্থক কর
পুঞ্জিত আয়োজন!
তুমি এস, এস নারী
আন গো তীর্থবারি।

স্নিগ্ধ হসিত বদন ইন্দু
সিঁথায় আঁকিয়া সিঁদূর বিন্দু
মঙ্গল কর, সার্থক কর,
শূন্য এ মোর গেহ।
এস কল্যাণী নারী
বহিয়া তীর্থবারি।" —রবীন্দ্রনাথ

এই হইল নারীর উদ্দেশ্যে পুরুষের মর্ম্মবাণী।

শৈশবে পুরুষের জীবনে জননীর প্রভাব যেমন কার্য্যকরী হয়, সেই রকম যৌবনে পত্নীর প্রভাবে পুরুষ অনেকাংশে প্রভাবান্বিত হয় এবং তাহার জীবনও বহুলাংশে তদনুরূপ ভাবেই সাফল্যমণ্ডিত হইবার সুযোগ পায়।

"Impulse is at the basis of our activity. Each impulse produces a whole harvest of attendant beliefs. A life governed by purposes and desires to the exclusion of impulses, is a tiring life—it exhausts vitality and leaves a man in the end, indifferent to the very purpose which he has been trying to achieve."—Russel.

পুরুষের কর্ম্মময় জীবনে যদি নারীর স্নেহচ্ছায়া না থাকে, যদি কঠোর কর্ত্তব্য সাধনের পর একটি প্রীতি-মধুর হাসিমুখ পুরুষ না দেখিতে পায়—তাহার সমস্ত কর্ম্মক্ষমতা ধীরে-ধীরে পঙ্গু হইয়া আসে, তাহার জীবনীশক্তিও আস্তে-আস্তে কমিয়া আসে—ইহাই বিধির

বিধান—নর ও নারী—পুরুষ ও প্রকৃতি। একজন অন্য জনের অনুপূরক।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"—বুঝিয়াছি আজি
বহু কর্ম্ম কীর্ত্তিখ্যাতি আয়োজনরাজি
শুষ্ক বোঝা হয়ে থাকে, সব হয় মিছে
যদি সেই স্তূপাকার উদ্‌যোগের পিছে
না থাকে একটি হাসি।"

তাই নারীর কর্ত্তব্য যে কত মহান্ ও বিস্তৃত তাহা চিন্তা করিলেই বোঝা যায়। তাহার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ও শুভবুদ্ধির উপর একটি মানুষের প্রায় সমগ্র জীবনের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে নারীই একটি সমগ্র জাতির ভাগ্যনিয়ন্ত্রী। সে ইচ্ছা করিলে অর্থাৎ সে বৈশিষ্ট্যানুপাতিক সুশিক্ষিতা হইলে, দেশকে উন্নতির শিখরেও তুলিতে পারে, আবার তাহারই অক্ষমতার দরুন একটি সমগ্র জাতি দুর্দ্দশার পঙ্কিল আবর্ত্তে নিমজ্জিত হইতে পারে। পত্নীত্বেই নারীর কর্ত্তব্যের আরম্ভ,—আর মাতৃত্বে সেই কর্ত্তব্যের পূর্ণ পরিণতি।

মহাভারতে আছে—

"যদি বৈ ন স্ত্রী রোচেত পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনো ন প্রবর্দ্ধতে।"

অর্থাৎ, স্ত্রী যদি পুরুষের মনোরঞ্জিনী এবং প্রহর্ষিণী না হয়,

তাহা হইলে পুরুষের অপ্রমোদ হইতে সন্ততিহীনতা ঘটে। ইহার বিপরীত ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেখানে স্ত্রী স্বামীর মনোবৃত্ত্যনুসারিণী হয়—সেখানে স্বামী ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গই লাভ করিয়া থাকে।

"অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষারতিরুত্তমা
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চহ ॥" —মনু ৯।২৮

অপত্য, ধর্ম্মকার্য্য, শুশ্রূষা, উত্তম রতি এবং নিজের ও পিতৃগণের স্বর্গ সকলই দারাধীন।

It is the type of an eternal truth that the soul's armour is never well set to the heart unless a woman's hand has braced it; and it is only when she braces it loosely that the honour of manhood fails."

—John Ruskin.

পুরুষের যদি রক্ষার কোন পন্থা থাকে তা' নারীর প্রজ্ঞা ও গুণের দ্বারাই। তা' না হ'লে রক্ষার নান্যঃ পন্থা।

তাই, আর্য্য ঋষিগণ সংসারী পুরুষের পক্ষে বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য সমাজে প্রধানতঃ বর ও ক'নের পরস্পর মনোনয়ন ও সম্মতির উপরই বিবাহ নির্ভর করে। তথায় উভয়ে উভয়ের সংস্পর্শে আসিয়া পরস্পরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় ও পরে নিজেদের ইচ্ছানুসারে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। ভবিষ্যতে যদি তাহাদের মধ্যে অমিল ও অসদ্ভাব দেখা দেয় তাহা হইলে বিবাহ বিচ্ছেদ করিতেও তাহাদের কুণ্ঠা দেখা যায় না! সখা-সখী ভাবের গুণ দেখিয়াই প্রতীচ্য দেশে সাধারণতঃ বিবাহ হইয়া থাকে। সেখানে দাম্পত্য

জীবনের সুখ-শান্তি পরস্পরের সখা-সখী ভাবের গুণের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তরুণরা সেখানে প্রধানতঃ শিক্ষিতা ও নৃত্যগীতকুশলা তরুণীই পছন্দ করিয়া থাকে; এবং মনে করে বাহিরের মনোমুগ্ধকর গুণ থাকিলেই সমস্ত জীবনে সুখী হইতে পারা যায়। কিন্তু বিবাহ অন্য জিনিষ। বিবাহিত জীবনে সুখ ও শান্তি স্থায়ী করিতে হইলে স্ত্রীর মাতৃভাবের একান্ত প্রয়োজন। স্ত্রীর মাতৃত্বের অঙ্গীভূত সেবা, যত্নপরায়ণতা, ক্ষমা, ত্যাগশীলতা ও সহ্যগুণ না থাকিলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জীবনই অশান্তিময় হইয়া ওঠে। স্থায়ী দাম্পত্য প্রেমের প্রধান অঙ্গই স্ত্রীর মাতৃভাব। মাতৃত্বের উপযোগী গুণসমন্বিতা স্ত্রীর সখীভাবের গুণ থাকিলে দাম্পত্য জীবন স্থায়ী সুখের হয়। কারণ, সংসারে দুঃখের অভাব নাই। জীবনে অস্বাস্থ্য, ক্লান্তি, ভগ্নাশা ও পরের দুর্ব্যবহারের জন্য মানসিক বিপর্য্যয় প্রায়শঃই ঘটিয়া থাকে। তখন হিতাহিত জ্ঞান সাধারণতঃ থাকে না। তখন সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ জনের উপরই মানুষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও অযথা রূঢ় ব্যবহার করিয়া ফেলে। তখন যদি স্ত্রীর মাতৃভাব-প্রসূত সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা, সেবা ও যত্ন-পরায়ণতা না থাকে, তখন যদি স্ত্রী আত্মসম্মানের হানিতে অধীর হইয়া অনুরূপ ব্যবহার করিয়া বসে তবে সাংসারিক বিপর্য্যয় অনি-বার্য্য। সংসারের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, স্বামীর জীবন সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে বধূত্বে মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা অবশ্য কর্ত্তব্য। মাতা যেমন শিশুর বিরক্তি, ক্রন্দন ও অভাবের কারণ সস্নেহ অনু-সন্ধিৎসার সহিত নিরূপণ করিয়া তাহার পরিপূরণে যত্নবতী হন, সেইরূপ পতিব্রতা স্ত্রীও স্বামীর ধাতু, অবস্থা ও প্রয়োজনের সহিত

সাগ্রহে পরিচিতা হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে স্বামীর অভাব ও চাহিদার পরিপূরণে প্রয়াসশীলা থাকিবেন। তাহা হইলে সর্ব্ব অবস্থাতে স্ত্রী অনেকাংশে স্বামীর মনকে স্নিগ্ধ, শান্ত, তৃপ্ত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইবেন।

রামচন্দ্রের উক্তিতে আমরা আদর্শ স্ত্রী-চরিত্রে পাই—

কার্য্যেষু মন্ত্রী—করণেষু দাসী
ধর্ম্মেষু পত্নী, ক্ষময়া ধরিত্রী
স্নেহেষু মাতা, শয়নেষু রামা
রঙ্গে সখী, লক্ষণ সদা প্রীয়ামে।”

মাতা

মাতৃত্বেই নারীত্বের পূর্ণ পরিণতি। মাতৃত্বই নারীত্বের চরম সার্থকতা। মাতা হইবার জন্যই নারীর জন্ম। দেহমনের সকল প্রস্তুতিই তাহার মাতৃত্বের পরিপোষণী। জগৎস্রষ্টার মহান্ উদ্দেশ্য নারীর মাতৃরূপেই সম্পূর্ণতা লাভ করে। সৃষ্টি-স্থিতি-পালনের কর্ত্রী নারী। সম্পূর্ণভাবে নারীর নৈপুণ্যের উপরই নির্ভর করে মানুষের জীবনের সর্ব্বাঙ্গীনতা ও সর্ব্বসার্থকতা। তাই নারী মাতা। সন্তানের শারীরিক ও মানসিক গঠনের পরিমাপ-সাধন মাতারই কৃতিত্ব। সে-ক্ষেত্রে আর কাহারও হাত নাই। মাতাই সেখানে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তাই নারী জন্ম ও জাতির নিয়ন্ত্রী। মনু বলিয়াছেন, মাতা পিতা হইতে সহস্রগুণে গরিয়সী। পিতা হইতে শিশু তাহার বংশানুক্রমিকতা ও সহজাত সংস্কার সকল লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার সেই বংশানুক্রমিকতা ও সহজাত সংস্কাররাজি তাহার জীবন ও বর্দ্ধনের অনুকূল করিয়া সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ করিবার ক্ষমতা ও দায়িত্ব মাতারই। কোন একটি উৎকৃষ্ট বীজ ক্ষেত্রে বপন করিতে হইলে—ক্ষেত্রকে বিধিমাফিক সেই বীজের পরিপোষণীয় ও পরিবর্দ্ধনীয়রূপে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। তবেই আমরা উৎকৃষ্ট বীজ হইতে উৎকৃষ্ট গাছ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ফলের আশা করিতে পারি। কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ বীজ অথবা শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র হইতেই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয় না। বীজ ও ক্ষেত্র উভয়েই উভয়ের পরিপূরক হওয়া আবশ্যক। কেবলমাত্র বীজকে অঙ্কুরিত করাতেই ক্ষেত্রের কর্ত্তব্য সীমাবদ্ধ নহে। অঙ্কুরে

তাহার পূর্ব্ব বীজের যাবতীয় গুণাগুণ সুসামঞ্জস্যরূপে ফুটাইয়া তোলা, প্রকৃতি হইতে সেই অঙ্কুরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-পরিপোষণী উপাদান সংগ্রহ করিয়া অঙ্কুরের জীবন ও বর্দ্ধনের অনুকূল করিয়া পরিবেষণ করার দায়িত্বও ক্ষেত্রেরই। যাবৎ বৃক্ষ জীবিত থাকে তাবৎ ক্ষেত্রই তাহাকে কত স্নেহ, কত মমতায় বক্ষে আঁকড়াইয়া ধরিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে তাহার যাবতীয় জীবনীয় ও বর্দ্ধনীয় রস বা উপাদান সরবরাহ করিয়া থাকে।

মা'টিই জননী। সন্তান জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই জননীর দেহ ও মনে আগমনীর সুর বাজিতে থাকে। পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হয় মাতার জীবনে সন্তান সম্ভাবনার প্রস্তুতি। সুসন্তান মানব-জীবনের পরম সম্পদ। সুসন্তান লাভের যাবতীয় লওয়াজিমা অর্থাৎ কল-কৌশল মাতারই করায়ত্ত। পিতা যত মহান্ ও যত কৃষ্টিসমৃদ্ধ, সহজাত সংস্কার-সম্পন্ন মহাপুরুষ হোন না কেন, মাতা যদি তদ্‌বৃত্ত্যানুসারিণী ও তদ্ভাবে অনুপ্রাণিতা ও উদ্বুদ্ধা না হন—তিনি যদি স্বামীর বৈশিষ্ট্যানুসারে তাঁহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া আনত করিতে না পারেন তবে স্বামীর গুণরাশি ও তাঁহার বংশানুক্রমিকতা পূর্ণভাবে তিনি সন্তানে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারিবেন না। তাই আমরা বহুক্ষেত্রে অত্যুদ্ভাসিত পুরুষের নিকৃষ্ট সন্তান দেখিতে পাই।

উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ পুরুষের উপযুক্ত অর্থাৎ স্বামীর সত্তা ও বৈশিষ্ট্য পরিপোষণী ও উদ্বর্দ্ধনী গুণবিশিষ্ট সমবিপরীত সত্তার পত্নীই পতির ভাবধারার পরিপূরক উৎকৃষ্ট সন্তানের জননী হইবার যোগ্য।

"স্বামী-স্বার্থে অটুট গতি
অবশ মনটি নয়,
ফন্দি-ফিকির ঐ তালেতেই
স্বামী উদ্দীপয়।
সদাচারে অটুট নিষ্ঠা
ইষ্টে প্রীতি যার
জীবন-কাজে ধর্ম্মনীতি
প্রীণন ব্যবহার
সদালাপে স্বামী আনতি
উছলপ্রাণা যেই
দীর্ঘজীবন সুপুত্রের মা
জানিস নারী সেই।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর

স্ত্রীর সেবা ও সম্বর্দ্ধনায় পুরুষ যখন উদ্দীপ্ত ও উচ্ছল হইয়া স্ত্রীতে উন্মুখ হইয়া ওঠে, স্ত্রীর সান্নিধ্য যখন একান্ত প্রীতিকর ও অপরিহার্য্যরূপে স্বামীর চিত্ত আকর্ষণ করিতে থাকে, যখন স্বামী-স্ত্রীর পৃথক অস্তিত্ব চিন্তা করিতেই পুরুষের মন অপারগ হইয়া ওঠে—আবার, স্ত্রীও যখন তাহার একান্ত গুণমুগ্ধ স্বামী-দেবতার চরণে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে নিঃশেষে নিবেদন করিতে পারিলেই নিজেকে কৃতকৃতার্থ বিবেচনা করে, তখনই হয় স্বামী-স্ত্রীর সার্থক মিলন—আর, সুসন্তানের জন্ম তখনই সম্ভব। স্ত্রীর নিষ্ঠা, অনুরক্তি, ভাব ও ভক্তিতে স্বামী যখনই অনুরঞ্জিত হইয়া সৎ ও সুস্থভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া স্ত্রীতে আনত

হইবেন—সৎ, সুস্থ, দীপ্তিমান ও দীর্ঘজীবি সন্তান লাভ তখনই সম্ভব।

"লক্ষ কাজে ব্যাপৃত থেকে
স্বামী সোহাগভরে
কোন্ ফাঁকেতে সময় ক'রে
স্বামীর তোয়াজ করে
আলোচনায় সৎ কথাটি
উদ্দীপনা প্রীতি
এমনি মেয়েই লভে নিশ্চয়
শ্রেষ্ঠ সুসন্ততি।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর

নারী তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনদের প্রতি যেমন ভক্তিমতী, স্নেহশীলা ও সেবা-পরায়ণা হইবে, তাহার আচার, ব্যবহার ও চাল চলনে যতই তাঁহারা তৃপ্ত ও সুখী হইবেন, ভবিষ্যৎ জীবনে সেও তাহার সন্তান-সন্ততি হইতে তেমন ব্যবহারই পাইবে। কারণ, কেবল উপদেশ বা তাড়নার দ্বারা সন্তান-সন্ততিকে সৎপথে পরিচালিত করা যায় না। ব্যবহারিক জগতে সদা-সর্ব্বদা প্রাত্যহিক চলনায় তাহারা যে আচার, ব্যবহার ও রীতি-নীতি প্রত্যক্ষ করে তাহার দ্বারাই তাহারা বেশী প্রভাবান্বিত হয় ও তাহাদের বাস্তব চলনাও হয় তেমনতরই। তাই যে নারী তাহার গুরুজন ও স্নেহাস্পদদের প্রতি যত নিখুঁতভাবে কর্ত্তব্য-পরায়ণা, উত্তর জীবনে তাহার প্রাপ্যও হয় তদনুরূপই। তাই সন্তান গর্ভে ধারণ করিবার পূর্ব্ব হইতেই মাতার চরিত্র, মাতার চলনা, মাতার অভ্যাস, ব্যবহার, ঝোঁক সুষ্ঠু ও

সুপরিমার্জ্জিতভাবে, জীবন-বৃদ্ধির সহায়করূপে গড়িয়া ওঠা প্রয়োজন। তবেই সন্তান সুস্থ ক্ষেত্রে সৎ পরিবেশে জন্মাইয়া ও বর্দ্ধিত হইয়া দেহে ও মনে সুস্থ ও স্বস্থ হইয়া প্রকৃত মানুষ হইয়া উঠিতে পারে। অন্যথায় মাতার স্বভাব ও চলনা যেখানে বিকৃত, আর তাহা যেখানে অশুভ ও অসুস্থ পরিবেশের সৃষ্টি করে, সেখানে সুসন্তান আকাঙ্ক্ষা করিলেও সুসন্তান লাভ সুদূরপরাহত।

আবার, সন্তান যেখানে বিবাহিত জীবনের নিশ্চিত ও অনায়াসলব্ধ ফল, সন্তানের জন্য যেখানে কোন প্রস্তুতি বা সাধনা নাই,—সন্তান সম্ভাবনা যেখানে নর-নারীর প্রবৃত্তি পরিতৃপ্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—সুসন্তান লাভের কথা সেখানে উঠিতেই পারে না—অন্যথায় সুসন্তানের কামনা যেখানে আন্তরিক ও অকপট সেখানে আন্তরিক ও অকপট সাধনারও প্রয়োজন। সেই জন্য পুরাকালে ভারতবর্ষে সুসন্তান লাভের জন্য যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের প্রথা প্রচলিত ছিল।

সন্তানধারণের মুহূর্ত্তে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক ও শারীরিক অবস্থা,—তাহাদের অবচেতন মনের স্তরে অতীত জীবনের সমুদয় চলনা ও কর্ম্মের অনুভূতির ছাপ—তৎকালীন পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব ও পিতামাতার বংশানুক্রমিতা—সমস্তই ভবিষ্যৎ সন্তানের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি গঠনের অবিচ্ছেদ্য উপাদান। ইহাদের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ সন্তানের জীবন ও বৃদ্ধির স্বরূপ।

যেখানে পিতামাতা প্রকৃত সুস্থ দেহ ও মনের অধিকারী, যেখানে পিতা বংশানুক্রমিকভাবে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিসম্পন্ন, এবং উচ্চ ও সৎ চারিত্রিক ও মানসিক গুণবিশিষ্ট,—মাতা যেখানে প্রকৃত

শিক্ষিতা ও সদ্‌বংশজাতা—স্বামীর মনোবৃত্ত্যনুসারিণী, সচ্চরিত্রা, সুশীলা, প্রকৃত স্বামী-সহধর্ম্মিণী, যেখানে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সময় দেহ-মনের সম্পূর্ণ অনুকূল ও তৃপ্তিপ্রদ, সেরূপ স্থলেই দেহ-মনে সুস্থ ও ধীমান সন্তানের জন্ম সম্ভব।

আর, ইহা সম্ভব করিয়া তুলিবার দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রধানতঃ মাতারই।

"তাই তো বলি মেয়ে আমার!
মায়ের আসন নেবার আগে
উমার মত ওঠ গজিয়ে
দুনিয়া সাজা তেমনি রাগে।"

তাহার পর সন্তান যখন প্রকৃতই সম্ভব হইয়া ওঠে—যখন নারী সত্যিকারের মাতা হইতে যান, তখন তাহার কর্ম্ম-জীবনের নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয়। যে-বীজ তাহাতে উপ্ত হইল, তাহাকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া অঙ্কুরিত করিবার সমুদয় দায়িত্ব একা মাতাকেই বহন করিতে হয়। মাতারই দেহের রসে ও মনের শ্বাসে, বীজ তাহার আবশ্যকীয় পুষ্টি আহরণ করিয়া থাকে। মাতার দেহ ও মনের স্বাস্থ্য যেরূপ হইবে, সন্তান তেমনতর দেহ ও মনের স্বাস্থ্য লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইবে। তাই জননী মাতা। তিনিই সন্তানের দেহ ও মনের প্রতিটি অংশের পরিমাপ সাধন করেন। তাই গর্ভাবস্থায় জননীর দেহ ও মন পরিপূর্ণভাবে সুস্থ ও প্রফুল্ল রাখা প্রয়োজন। আমাদের দেশে নিয়ম আছে গর্ভিণীর কোনরূপ ইচ্ছা বা কামনা অপূর্ণ রাখিতে নাই। সেই জন্য গর্ভাবস্থায় সাধ-ভক্ষণের বিধি এ দেশে প্রচলিত।

যাহা তাহার খাইতে সাধ হয়, যেরূপ পরিচ্ছদে সে তৃপ্তি বোধ করে—তাহাকে সেরূপ সামগ্রী প্রদানের বিধিই এদেশে প্রচলিত। যাহাতে তাহার মন প্রফুল্ল ও তৃপ্ত থাকে তদুদ্দেশ্যেই এ নিয়মের প্রবর্ত্তন। তাহার স্বাচ্ছন্দ্য ও সন্তুষ্টি বিধানের দিকে পরিবারের প্রত্যেকের দৃষ্টি সজাগ রাখা আবশ্যক। কারণ, মাতার দেহ-মনের স্বাস্থ্যের উপরই সন্তানের দেহ-মনের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। মাতার দেহ তখন দেবমন্দিরের ন্যায় পবিত্র। তাহাতে তাঁহার শিশু-দেবতা অধিষ্ঠিত। তাই তখন সৎ ও উন্নত চিন্তা—সৎ ও উন্নত আলোচনা, সৎ ও উন্নত আবেষ্টনীর মধ্যে মাতা তাঁহার শিশু-দেবতার আরাধনায় কালযাপন করিবেন। মাতার মস্তিষ্ক-প্রসূত ভাবধারা, তাঁহার প্রতিমুহূর্ত্তের চলনার ছন্দ, তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানের মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষকে তদনুরূপভাবেই ছন্দায়িত করিয়া তোলে। তাই এরূপ অবস্থায় মাতা যেরূপ পবিত্র ও উন্নতভাবে জীবনযাপন করিতে সমর্থ হইবেন,—গর্ভস্থ সন্তানেরও তদ্রূপ উন্নত ও পবিত্র হইয়াই ভূমিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। এইজন্যই গর্ভিণীর বাসগৃহকে মহাপুরুষের আলেখ্য ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলীর দ্বারা সুশোভিত করিবার বিধি আছে,—যাহাতে মাতার মন স্বতঃই উন্নত ভাবের দ্বারা অনুরঞ্জিত থাকিবার সুবিধা পায়।

গর্ভাবস্থায় প্রত্যেক মাতারই উচিত যথোপযুক্ত পরিশ্রম করা। কেবল শুইয়া বসিয়া আলস্যে কাল কাটানো কোন মতেই উচিত নহে। কারণ, আলস্যে কালযাপন করিলে কিছুতেই দেহ ও মনের প্রশান্তি আসিতে পারে না। দেহ ও মনের স্বাস্থ্যও তাহাতে বিপন্ন হয় এবং

গর্ভস্থ সন্তানেরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাযথরূপে পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। আবার যথোপযুক্তরূপে কর্ত্তব্য সম্পাদনে যেরূপ মনের প্রশান্তি লাভ করা যায়—এমন আর কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই মনের শান্তি বজায় রাখিতে হইলে গর্ভিণীর সর্ব্বদা আপন কর্ত্তব্য সম্পাদনে যত্নবতী থাকা উচিত।

"প্রসব করা কঠিন যদিও
সন্তান পোষণ সহজ নয়—
সন্ধিৎসা সহ বুদ্ধিমতী
দক্ষ-নিপুণ হতেই হয়।"

সন্তান যখন মাতৃগর্ভ হইতে মাতৃক্রোড়ে আবির্ভূত হয়—তখন মাতাই শিশুর অস্তিত্বের ভিত্তি।

মাতার স্নেহল-সজাগ দৃষ্টি, বিচক্ষণতা ও নিপুণতাই ক্ষুদ্র শিশুর জীবন-ধারণের প্রধান উপকরণ। মাতা হইতেই সে তাহার প্রয়োজনীয় আহার ও আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে। শিশুর প্রত্যেকটি হাব-ভাব, প্রতিটি অঙ্গ-সঞ্চালন, প্রতিবারের হাসি-কান্না যদি মাতার বোধের পাল্লার মধ্যে ধরা না পড়ে, যদি মাতা সেগুলির সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার যথাযথ ব্যবস্থা মাফিক পরিপূরণ না করিতে পারেন, তবে শিশুর জীবনের ভিত্তিতেই ফাটল দেখা দিবে। শিশুর জীবন ও বর্দ্ধন খিন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া উঠিবে। তাই জন্মানর পূর্ব্বেই শিশু-পালনের যাবতীয় নিয়ম-কানুন মাতার আয়ত্তে আসা একান্ত প্রয়োজন। শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য মাতারই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। শিশুর স্নান, আহার ও বিশ্রাম

সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাবেই শিশুকে বহুক্ষেত্রে অসুস্থ করিয়া তোলে,—সময়-সময় তাহার জীবনও বিপন্ন হইয়া পড়ে। কেবল ক্ষুধা পাইলেই শিশু কাঁদে না। সুতরাং শিশু কাঁদিলেই তাহাকে খাওয়াইতে হইবে অথবা তাহাকে কোলে তুলিয়া আদর করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। সস্নেহ অনুসন্ধিৎসার সহিত তাহার কান্নার কারণ নিরূপণ করিয়া, তাহা নিরসন করাতেই মাতার কৃতিত্ব। অতি শিশুকাল হইতেই—এমন কি শিশুর জন্মের পর হইতেই তাহার অভ্যাস, ঝোঁক ও মেজাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া সুন্দর ও কল্যাণে সমাবেশ করিবার দায়িত্বও মাতারই। তখন হইতেই আরম্ভ হয় তাহার শিক্ষা।

প্রকৃতির সহিত তাল রাখিয়া শিশুর শারীরিক ও মানসিক গঠনকে সুস্থ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে মাতাই সক্ষম। মাতাই শিশুকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়া থাকেন তাহার জীবনের গোড়া হইতে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাওয়ান, এমন কি নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোলে করিয়া আদর করার ভিতর-দিয়াও মাতা শিক্ষা দেন তাহাকে সহিষ্ণুতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার শিক্ষা।

শিশুর জন্মার্জ্জিত সংস্কাররাশি তাহার মস্তিষ্কের প্রতি কোষে সুপ্তাবস্থায় নিহিত থাকে। সময় এবং অবস্থার গতিতে সেগুলি ধীরে-ধীরে বিকশিত হইতে থাকে। উপযুক্ত সময়ে এবং যথোপ-যুক্তভাবে যদি সেই বিকাশোন্মুখ সংস্কাররাশিকে পুষ্টিদানে সংবর্দ্ধিত করিয়া না তোলা হয়, যদি সেগুলিকে সুসংবদ্ধ করিয়া জীবন ও বর্দ্ধনের অনুকূল করিয়া নিয়ন্ত্রিত করা ন হয়, তবে অনেক স্থলে

সেগুলি জীবনে বিপর্য্যয়েরই সৃষ্টি করে, অথবা উপযুক্ত পুষ্টি ও সাহায্যের অভাবে তাহা অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাই মাতার কর্ত্তব্য তাহার শিশুসন্তানের ধাতু ও ঝোঁক বুঝিয়া, তাহার প্রকৃতির সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হইয়া স্নেহের সহিত তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করা। ঠিক সময় ও সুযোগ অনুযায়ী শিশুর সৎ প্রবৃত্তি বা ঝোঁককে যদি অভ্যাসে রূপান্তরিত করা না যায়, তবে সময় পার হইয়া গেলে হাজার চেষ্টা বা শাসনেও তাহা আর আয়ত্তে আনা যায় না—

"The hand that rocks the cradle rules the world."

শিশুই জাতির জনক। আর এই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন ও চলনা মাতার জ্ঞান ও বিবেচনা-প্রসূত প্রয়াসের উপরই বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই মাতার বুদ্ধি-বিবেচনা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যে কতদূর নির্ভুল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক তাহা সহজেই অনুমেয়!

মাতার উপর একটি জীবনের ভিত্তি স্থাপনের দায়িত্ব। এই ভিত্তি যত দৃঢ় ও মজবুত হইবে, জীবন-সৌধও ততই আকাশচুম্বি হইয়া ঝড়ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করিয়া সগৌরবে আপন অস্তিত্বকে অটুট রাখিতে সক্ষম হইবে। আর, এইরূপেই গড়িয়া উঠিবে একটি সুদৃঢ় জাতীয় জীবনের ভিত্তি। তাই মাতা জীবন ও জাতির নিয়ন্ত্রী।

মাতাই শিশুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও নিকটতম আত্মীয়। শিশুর জীবনে মাতার প্রভাব অপরিসীম ও অপ্রতিহত। জীবনের সারাংশ শিশুকাল তাহার মাতার সান্নিধ্যেই প্রধানতঃ অতিবাহিত হয়। তাই শিশু-জীবনের সৎ ও অসৎ উভয়বিধ পরিণতির জন্য প্রধানতঃ মাতাই দায়ী।

শিশুগণ বড়ই অনুকরণপ্রিয়। তাহারা সম্মুখে যাহা অনুষ্ঠিত হইতে দেখে তাহাই আচরণে চরিত্রগত করিয়া ফেলে। ইহাই শিশু-চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিশুকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী করিয়া গড়িয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে—শিশুর যাহারা নিকটতম পার্শ্বচর, তাহাদের প্রত্যেককেই প্রকৃত মানুষ নামের যোগ্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাহাদের আচার, ব্যবহার, বাক্ ও চলনা সম্পূর্ণ-ভাবে মনুষ্যোচিত হওয়া দরকার। তাহাতে যদি কোন গলদ থাকে—অর্থাৎ আপনাপন চরিত্র যদি পরিমার্জ্জিত ও পরিশুদ্ধ না হয়—যদি শিশুকে মানুষ করিবার প্রয়াস কেবল মাত্র সৎ উপদেশ ও তাড়নার দ্বারাই চালিত হয়—তাহা হইলে শিশু মানব না হইয়া দানব হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ, শিশুর কোমল ও সহজনম্য চরিত্র, আচরণ ও উপদেশের বিরুদ্ধভাবের দ্বারা পিষ্ট হইয়া একটি অস্বাভাবিক বহুধা-বিভক্ত বিকৃত ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হইয়া উঠিবে—ইহা অতি নিশ্চয়। যাহাদের উপদেশ ও আচরণে কোন সামঞ্জস্য নাই তাহাদের প্রতি স্বতঃই শিশুচিত্ত শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িবে। আর, তাহাই হইবে শিশু-জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ।

কারণ, "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।" শ্রদ্ধাহীনের পক্ষে জ্ঞানলাভ বা মনুষ্যত্বলাভ অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই শিশুর নিকট আত্মীয়-দের বাক্য, ব্যবহার, মৌখিক উপদেশ ও বাস্তব চলনা যদি সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জস না হয় তবে সেটা শিশুর পক্ষে সমূহ ক্ষতিজনক। তাই শিশুকে যেমনতর চলিতে ও বলিতে উপদেশ দেওয়া হয়, মাতার চলন-চরিত্র ঠিক সেই সৎ-উপদেশের পরিপূরক হওয়া একান্ত প্রয়ো-

জন—আর সেই সৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াই শিশু চরিত্র তাহার অজ্ঞাতসারে স্বাভাবিকভাবে ধীরে-ধীরে গড়িয়া ওঠে।

শিশুর স্বাভাবিক বাক্য ও চলনা যদি শিশুর জীবন ও বর্দ্ধনের ক্ষতিকারক না হয়—তবে তাহাতে কখনই বাধা সৃষ্টি করা উচিত নহে। তাহার নিজের ধাতু ও ঝোঁক-অনুযায়ী তাহাকে বাড়িতে সুযোগ দেওয়া উচিত। কারণ, প্রত্যেকেই তাহার আপন বৈশিষ্ট্যে অপর হইতে ভিন্ন। তাই প্রত্যেকেরই চলন ও বলন অপরের চলন-চরিত্র হইতে বিভিন্ন। আর, ইহাই স্বাভাবিক। প্রত্যেকটি শিশু যাহাতে তাহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বড় হইতে সুযোগ পায় মাতার দৃষ্টি সর্ব্বদাই সেই দিকে সজাগ রাখা উচিত। শিশুর কোমল ও সহজ নমনীয় স্বাভাবিক মনোবৃত্তির উপর অপর কাহারও নিজস্ব ভাবধারা জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া উচিত নহে। ইহাতে তাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। আর, এইরূপে সে ক্রমে-ক্রমে নকল মানুষ হইয়া গড়িয়া ওঠে। শিশুর স্বাভাবিক চালচলন যাহাতে আপন বৈশিষ্ট্যে সুস্থ ও পরিমার্জ্জিত হইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে মাতা কেবল তাহারই সাহায্য করিবেন।

"শিশু যখন আধ বুলিতে
যে লক্ষ্যেতে যা' যা' কয়।
তা না বুঝে চাপান কথায়
আনেই বোধের বিপর্য্যয়।"

শিশু তাহার প্রতিটি কার্য্য ও প্রতিটি চলনার জন্য মাতার নিকট হইতে বাহবা প্রত্যাশা করে। এটা শিশু-চরিত্রের একটা প্রধান

বৈশিষ্ট্য। আর, শিশুর এই মনোবৃত্তি বা আকাঙ্ক্ষাই শিশুকে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রধান কলকাঠি, আর ভগবান-প্রদত্ত এই কলকাঠিটি মাতারই করায়ত্ত। মাতা যদি সন্তান পালনে সুশিক্ষিতা ও যত্নবতী হন্, তাঁহার যদি আপন সন্তানের চরিত্র ও ঝোঁক সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকে, তবে তিনি শিশুর এই মনোবৃত্তির সাহায্যে অনায়াসেই তাহাকে সৎ ও ন্যায়পথে পরিচালিত করিতে পারিবেন। আর, যাহা তিনি তাঁহার সন্তানের জীবন ও বর্দ্ধনের পক্ষে ক্ষতিকারক বিবেচনা করিবেন, অতি সহজেই তিনি তাহার গতিরোধ করিতে পারিবেন।

মাতার নিকট হইতে বাহবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যে শিশুর যত প্রবল ও দুর্নিবার, সেই শিশুর ভবিষ্যৎও তত উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ। কারণ, কম-বেশী সমস্ত জীবনই সে এই আকাঙ্ক্ষা দ্বারাই পরিচালিত হয়। তাই মাতার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইল, তাঁহার প্রতি যাহাতে শিশুর প্রীতির টান উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহারই ব্যবস্থা করা।

"মাতৃভক্তি অটুট যত
সেই ছেলেই হয় কৃতী তত।"

মহাপুরুষ ও মনীষীদের জীবন আলোচনা করিলে এই ঋষিবাক্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে আর কোন সংশয়ই থাকে না। শিশুর যদি মাতার প্রতি টান ও শ্রদ্ধাভক্তি অটুট ও অব্যাহত থাকে, সে-শিশু জীবনে বড় ও মহৎ হইবেই হইবে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। মাতার প্রতি টানের উর্দ্ধগতি তাহার বৃত্তির টানের নিম্নগতিকে পরাস্ত করিয়া তাহাকে সৎ ও ন্যায়পথে পরিচালিত করিবে। মাতার প্রীতিফুল্ল মুখই হইবে শিশুর

সর্ব্বপ্রকার খেলা ও কাজের প্রেরণা। মাতাকে খুসী ও তৃপ্ত করিতে পারাতেই যদি তাহার তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি সম্ভব হয়, আর মাতার বিষণ্ণ মুখ দেখিলেই যদি তাহার সব আনন্দ ও খেলা হতভম্ব হইয়া যায়—তাহাই হইবে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে বড় হইবার শুভ নির্দ্দেশ।

আর, ইহা করিতে হইলে, মাতাকে হইতে হইবে শিশুর জীবনের প্রতি ব্যাপারে সর্ব্বক্ষণের সাথী। মাতাই হইবেন একাধারে শিশুর সাথী, বন্ধু ও গুরু। তাঁহার নিকট হইতেই শিশু পাইবে তাহার আনন্দ ও উৎসাহের খোরাক। মাতার স্নেহে, মাতার আদরে, মাতার সাহচর্য্যে শিশুর জীবন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত থাকিবে। মাতা যতদূর সম্ভব নিজের হাতে তাঁহার শিশুসন্তানের সকল প্রয়োজন পরিপূরণ করিবেন। কখনও অপর কাহারও হাতে অথবা দাসী চাকরের হাতে তাঁহার শিশু-দেবতার সেবার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না,—তাহাতে শিশুর শারীরিক ও মানসিক উভয় দিকেরই ক্ষতির সম্ভাবনা। আর, তাহাতে মাতাও ধীরে-ধীরে শিশুর জীবন হইতে দূরে সরিয়া যান। তখন আর মাতার ব্যক্তিত্ব শিশু-জীবনে বিশেষ কার্য্যকরী হয় না। তাই অশনে, ব্যসনে, সুখে, দুঃখে মাতাই হইবেন শিশুর প্রধান পার্শ্বচর।

এই প্রকারে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুর অভ্যাস, ব্যবহার ও ঝোঁককে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে শিশুর জীবনের গতি সাধারণতঃ সুস্থ ও স্বাভাবিক খাতে বহিতে থাকিবে।

"যা হয় না পাঁচে
তা' হয় না পঞ্চাশে।"

ইহা অতি সত্য কথা। পাঁচ-সাত বৎসর পর্য্যন্ত শিশুর জীবন যেভাবে গড়িয়া ওঠে—তাহাই প্রায়শঃ হয় তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের কাঠামো। উত্তর জীবনে এ-কাঠামোর অতি অল্প অংশই রদবদল করা যায়। "আহা করুক, বড় হ'লেই সেরে যাবে"—এ-কথা যে কতদূর অজ্ঞতা ও অবিবেচনা প্রসূত তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। Habit is the second nature. পাঁচ-সাত বৎসর পর্য্যন্ত যে অভ্যাস একবার দাঁড়াইয়া যায়, তাহা পরিবর্ত্তন করা বড়ই কঠিন। তাই পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুর চরিত্র ও আচার-ব্যবহারকে মাজিয়া ঘসিয়া সুষ্ঠু ও পরিমার্জ্জিত করিয়া গড়িয়া দিতে পারিলে শিশুর ভবিষ্যৎ-জীবন সম্বন্ধে আর বিশেষ উৎকণ্ঠার কারণ থাকে না। তখন সে তার স্বাভাবিক গতিতেই চলিতে থাকে। আর, এ-দায়িত্ব প্রধানতঃ মাতারই।

শিশুর চরিত্র গঠনের পক্ষে আর একটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক ব্যাপার হইতেছে, শিশুর উপস্থিতিতে পিতামাতার মধ্যে মনান্তর বা কলহ। ইহা যে শিশুর জীবন ও চরিত্রকে কতখানি বিক্ষিপ্ত ও অশান্তিময় করিয়া তোলে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শিশু-জীবনের ভিত্তিই হইল পিতামাতার স্নেহ। পিতামাতার ভিতর-দিয়াই ধীরে-ধীরে সে বাহিরের দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত হয়। সেখানকার প্রীতিপূর্ণ শান্ত আবহাওয়া তাহার মানসিক শান্তি রক্ষার পক্ষে একান্তই আবশ্যক। পিতা ও মাতা উভয়েই শিশুর পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র। একে যদি অন্যের প্রতি অশিষ্ট আচরণ করেন অথবা অশ্রদ্ধেয় বাক্য ব্যবহার করেন, আর শিশু যদি তাহার প্রত্যক্ষদর্শী

হয় তবে তাহার পিতৃমাতৃ ভক্তির মূলই শিথিল হইয়া পড়িবে—আর তাহাই হইবে তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সর্ব্বনাশ। তাই পিতামাতার মধ্যে যদি কখনও কোনও কারণে মতান্তর বা মনান্তর হয়ই—শিশুর ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তাহার অসাক্ষাতেই সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার মীমাংসা বা মিটমাট করিয়া লওয়া উচিত। এই বিরোধের কণামাত্র বিষবাষ্পও যাহাতে তাঁহাদের শিশুকে স্পর্শ না করে সে দিকে তাঁহাদের অবহিত হওয়া উচিত।

শিশু যাহাতে তাহার পিতা, পিতামহ এবং তাহার বংশের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া ওঠে, যাহাতে নিজবংশের মহত্ব ও গুণ-গরিমার কাহিনী শ্রবণ করিয়া ধীরে-ধীরে নিজেকেও সেই বংশের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে তাহার প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগে, তাহার ব্যবস্থাও মাতাকেই করিতে হয়। স্নেহে আদরে শিশুকে বশীভূত করিয়া ধীরে-ধীরে তাহার কোমল চিত্তে বড় হইবার, মহৎ হইবার স্পৃহা মাতাকেই জাগাইতে হয়। তাহার পর শিশু যতই বড় হইতে থাকে, একটি-দুইটি করিয়া তাহার জীবনে ততই অপরিচিতের আগমন ঘটিয়া থাকে; কত অচিন্তিত ও অনভ্যস্ত পরিবেশের ভিতর-দিয়াই তাহার জীবনের গতি বহিয়া চলে—কিন্তু তাহার মাতৃভক্তিরূপ ধ্রুবতারা যদি তাহার মানসাকাশে চির-জাগরূক থাকে—জীবনে পথভ্রান্ত ও বিধ্বস্ত সে কমই হইবে।

নারীর সাজ-সজ্জা

মানব সভ্যতার আদি যুগে নর ও নারী কেহই কোন প্রকার দৈহিক আবরণ অথবা সাজ-সজ্জার প্রয়োজন বোধ করিত না। তখন তাহারা প্রকৃতির কোলে, প্রকৃতির নিরাবরণ সন্তানরূপেই পরিবর্দ্ধিত হইত। দেহ ও মনের কোন প্রকার আবরণের প্রয়োজন তাহাদের তখন ছিল না।

তাহার পর কালধর্ম্মানুসারে ধীরে-ধীরে মানব সভ্যতার উদয় হইতে লাগিল। মানব-মানবী প্রাকৃতিক প্রয়োজনে ক্রমে-ক্রমে তাহাদের আদিম স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল। দেহ ও মনের পরিচ্ছদ বা আবরণের প্রয়োজন ও বাহুল্য বোধ ক্রমশঃই মানব সমাজে বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। সভ্যতার আলোকে তাহারা দেখিতে লাগিল নিরাবরণ ও নিরাভরণ মন ও দেহ তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষার অনুকূল নহে। মনের আবরণ বিষয়ক আলোচনা আমাদের এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে, এখানে আমরা কেবল নারী জাতির দৈহিক সাজ-সজ্জার বিষয়েই আলোচনা করিব।

সর্ব্বপ্রথম আমরা দেখিব, নারীর সাজ-সজ্জার প্রয়োজনবোধ কেবল দৈহিক কামনা পরিপূরণের জন্যই উদ্ভূত—না ইহার সহিত তাহাদের মানসিক চাহিদারও যোগ আছে? ইহা তাহাদের বৈশিষ্ট্য-পরিপূরক সত্তা-সম্বর্দ্ধনী, অথবা ইহা তাহাদের জীবনে শুধু বাহুল্য-কেই আমন্ত্রণ করে? সাজ-সজ্জা নারীকে সহজ ও সুন্দর করিয়া গার্হস্থ্য ও সমাজ জীবনে তাহাকে স্বচ্ছন্দ করিয়া তোলে অথবা ইহা তাহাদের

অর্থনৈতিক জীবনের কাঠামোকে বিধ্বস্ত করিতে সাহায্য করে? কি প্রকার পরিচ্ছদ বা সাজ-সজ্জা তাহাদিগকে তাহাদের স্থান, কাল ও অবস্থার অনুকূলে গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করে, তাহাদের বৈশিষ্ট্য তাহাদিগকে অব্যাহত রাখে, তাহাদের গার্হস্থ্য ও সমাজ জীবনকে সুষ্ঠু, শোভন ও মঙ্গলপ্রসূ করিয়া গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে আমরা সর্ব্বপ্রথম সেই আলোচনা করিব।

নারীকে প্রধানতঃ চারি মূর্ত্তিতে আমরা সমাজ জীবনে দেখিতে পাই। তাহারা কন্যা, ভগিনী, বধূ ও জননী মূর্ত্তিতেই মানব-সমাজে সমধিক পরিচিত। নারী=নারয়তি (বৃদ্ধি পাওয়ায়) ইতি নারী। নারীর প্রিয় পরিজন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সন্তান-সন্ততিদিগকে সর্ব্ব রকমে বৃদ্ধি পাওয়ানোই নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আর, এই বৃদ্ধি পাওয়ানোতেই তাহার প্রকৃতি তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট। নারীর বৈশিষ্ট্যে আছে নিষ্ঠা, ধর্ম্ম, শুশ্রূষা, সেবা, সাহায্য, সংরক্ষণ, প্রেরণা ও প্রজনন। ইহাদের কোন-একটি হইতে বিচ্যুত হইলে নারী তাহার নারীত্বকে ক্ষুণ্ণ করিয়া তোলে। সুতরাং নারী-চরিত্রের সর্ব্ব প্রধান বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণরাজীর মধ্যে একটি হইল সংরক্ষণপটুতা। তাই ঈষৎ কৃপণতা নারী-চরিত্রের দোষ না হইয়া তাহার একটি গুণরূপেই গণ্য হয়। যে-সংসারে নারী সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত, অর্থাৎ অতিশয় দানশীলা, সে সংসারে পুরুষ যতই না কেন আহরণপটু হউক সংসারে আশানুরূপ স্বচ্ছলতা থাকা বড়ই কষ্টসাধ্য। সংসারে পুরুষ করে আহরণ, আর নারীর কর্ত্তব্য হইল সেই আহরিত সামগ্রীর যথাযথ সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু পরিবেষণ। তাহার প্রিয়জন ও সন্তান-সন্ততির জীবনবৃদ্ধি, স্বচ্ছলতা,

স্বচ্ছন্দতা যে নারীর এই সংরক্ষণপটুতার উপর কতখানি নির্ভরশীল তাহা বলিয়া শেষ করা না।

তাই সংসারে বা সমাজে শান্তি ও কল্যাণ আনিতে হইলে অশনে, ব্যসনে, চিন্তায় ও চলনে নারীকে হইতে হইবে সংযত ও সুনির্দ্দিষ্ট। সাজ-সজ্জায় বা পরণ-পরিচ্ছদে কোন প্রকার অসংযম বা প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় নারীর পক্ষে কোন দিক দিয়াই সমর্থনযোগ্য নহে। নারী গৃহের লক্ষ্মী। লক্ষ্মী মানে শ্রী। আবার, শ্রী কথা আসিয়াছে সেবা করা হইতে। নিজের প্রয়োজনকে সংযত ও সংহত করিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত তাহাকে বাড়িতে না দিয়া সুষ্ঠু, শোভন ও সুরুচি-সম্পন্ন করিয়া নারী তাহার সংসার বা সমাজের সেবা করিয়া থাকে। আর ইহার ব্যতিক্রম যেখানে সেখানে নারী অমঙ্গলের প্রসূতি।

জাতির জীবনে নৈতিক অধঃপতনের একটি সর্ব্বপ্রধান চিহ্ন হইল মৌলিকত্বহীনতা। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। কি সমাজ জীবনে, কি রাষ্ট্র জীবনে, প্রত্যেক জাতিই স্বকীয় সংস্কৃতি ও রীতি-নীতিতে অনেকাংশে অপর জাতি হইতে ভিন্ন। প্রত্যেক সমাজেরই শিক্ষা, সভ্যতা, আচার, ব্যবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুপূরক হিসাবে গড়িয়া ওঠে। এই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে একের অন্য হইতে পৃথক হওয়া স্বাভাবিক।

তাই ভাল-মন্দ, প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন বিচার না করিয়া একে অন্যকে অন্ধভাবে অনুকরণ করিবার শিক্ষা বা প্রবৃত্তি জাতির ক্লীবত্বেরই পরিচায়ক। বৈশিষ্ট্য-উল্লঙ্ঘনী শিক্ষা বা সংস্কৃতি জাতীয়

জীবনের অপমৃত্যুকেই আহ্বান করে। জাতির গৌরব প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, আশুতোষ প্রভৃতি মনীষীদিগের জীবনী আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা জাতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পোষাক-পরিচ্ছদের উপর কতখানি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও অস্খলিত-নিষ্ঠ ছিলেন। ব্যক্তি-স্বার্থ-সম্ভূত কোন প্রয়োজনবোধই তাঁহাদিগকে আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্যচ্যুত করিতে পারে নাই।

জাতি বা সমাজের যাহারা প্রাণ, জাতির ধাত্রী এবং পালয়িত্রী যাহারা—যাহাদের কল্যাণ-হস্তের আলোক-বর্ত্তিকা বহুলাংশে জাতীয় জীবনে গন্তব্য পথের সন্ধান দেয়, সেই নারীজাতির আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ যে কতদূর সংযত ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য পরিপূরক হওয়া দরকার তাহা সহজেই অনুমেয়। সাজ-সজ্জায় বা পরণ-পরিচ্ছদে অন্ধভাবে অপর জাতির অনুকরণ করা নারী-সমাজের পক্ষে কোন দিক দিয়াই সমর্থনযোগ্য নহে। ইহাতে তাহারা নিজেদের সঙ্গে-সঙ্গে, নিজেদের সমাজ এবং জাতিকেও জগতের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া তোলেন। তাহা ছাড়াও আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক দুর্গতির বিষয় বিবেচনা করিলে আমাদের জীবনযাত্রার কোন দিকই অপ্রয়োজনীয় বা বাহুল্যভাবে বাড়িতে দেওয়া উচিত নহে। যে-দেশে বা যে-সমাজে অধিকাংশ লোকের পক্ষে কেবল খাইয়া বাঁচিয়া থাকাটাই একটা বড় সমস্যা, সেখানে পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য অন্যায্য ব্যয়বাহুল্য কেবলমাত্র অশোভন নয়, অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

সাজ-সজ্জার প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র দৈহিক প্রয়োজন পরি-

পূরণের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট হয় নাই, মানসিক চাহিদাও ইহার সহিত ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। নর ও নারী উভয়ের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা পরস্পরের চক্ষে কমনীয় ও আকর্ষণীয়রূপে প্রতিভাত হওয়া। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ তখনই স্থায়ী ও তৃপ্তিপ্রদ হয় জীবনে, যখন ইহার সহিত শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রমবোধ জড়িত থাকে। স্নেহ, প্রেম বা ভালবাসা প্রভৃতি মানব-হৃদয়ের পবিত্র, সুকুমার ও অপার্থিব বৃত্তিসমূহ স্বাভাবিক, সুন্দর ও কল্যাণজনকভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে ও স্থায়িত্ব লাভ করিতে তখনই পারে যখন নরনারী উভয়েরই পরস্পরের প্রতি থাকে একটি সহজ ও স্বাভাবিক শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রমবোধ। আর শিক্ষা, দীক্ষা, আচার-ব্যবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ জীবনে শ্রদ্ধা আকর্ষণে অনেকখানিই সাহায্য করে।

তাই, নারীর সাজ-সজ্জার রুচি ও অভ্যাস শিশুকাল হইতেই এমনভাবে সুচিন্তিতরূপে নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার যাহাতে উত্তর জীবনে তাহারা জাতি, সমাজ ও নিজ পরিবারের অবজ্ঞেয় ও ক্ষতিকারক না হইয়া, শ্রদ্ধেয় এবং উদ্দীপনাময়ীরূপে গড়িয়া উঠিতে সমর্থা হয়। নারী সমাজের মাতা, কন্যা ও বধূ। তাহারা পুরুষের বড় আদরের ও গর্ব্বের সামগ্রী। নারীর মাধুর্য্যে ও গৌরবে পুরুষ বাহির বিশ্বে নিজেকে অনেকখানি গৌরবান্বিত বোধ করে। আর নারীর অবমাননায় তাহার মাথা স্বতঃই হেঁট হইয়া পড়ে। তাই নারীর সাজ-সজ্জা সহজ, অনাড়ম্বর ও নয়ন-মন-তৃপ্তিপ্রদ, অথচ গাম্ভীর্য্য ও শালিনতাপূর্ণ হওয়া দরকার।

আবার, লজ্জাই নারীর ভূষণ। তাই বলিয়া অপ্রয়োজনীয়

জড়তাও কোনদিক দিয়াই সমর্থনযোগ্য নহে ; তাহা এ-যুগে একেবারেই অচল। যে সাজ-সজ্জায় নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্য নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পায় তাহা অতি নিকৃষ্ট স্তরের সজ্জা। ইহাতে সজ্জাকারিণী নিজেই লোকচক্ষু সমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হয়। পুরুষ হয়তো সাময়িকভাবে সেরূপ সজ্জার প্রতি চমৎকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করিতে পারে, কিন্তু তাহার হৃদয় তাহাতে সাড়া দেয় না, তাহার চক্ষুও তাহাতে তৃপ্ত হয় না। সাময়িক মোহ কাটিলেই সে ইহার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠে। কারণ, তাহার মাতা বা ভগিনীর সৌন্দর্য্য তাহার নিকট একান্ত পবিত্র ও নিজস্ব জিনিষ। সে চায় না, ইহা সাধারণ পণ্যের ন্যায় লোকচক্ষুগোচর হউক। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন—"নারীর সাজ-সজ্জা, পরণ-পরিচ্ছদ, চলন-চরিত্র এমনতর হওয়া উচিত—যাহা পুরুষের মনে একটা উন্নত পবিত্র সৎভাবের সৃষ্টি করে, আর ইহা সুপ্রজননের ও মানুষকে শ্রদ্ধোদীপ্ত করারও একটা উত্তম উপকরণ—ইহার বহুলতায় বাহুল্যকেই ডাকিয়া আনিবে—সাবধান হইও।"

মেয়েদের ব্যায়াম

স্বাস্থ্য জীবনের পরম সম্পদ। এ জগতের কোন রূপ, রস, গন্ধ, যশ, অর্থ, মান—কোন সুখ-সম্পদই স্বাস্থ্যহীনের পক্ষে আনন্দ বা তৃপ্তিপ্রদ নয়। আবার, দেহের স্বাস্থ্যের সহিত মনের স্বাস্থ্যও ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। দেহ যেখানে রুগ্ন, মনও সেখানে অসুস্থ; অসুস্থ মন পার্থিব বা অপার্থিব কোন সাড়াই সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। তাই শাস্ত্রে আছে "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"। যত্ন ও পরিচর্য্যার দ্বারা শরীর সুস্থ রাখাই ধর্ম্ম-সাধনার প্রথম সোপান।

প্রাণীদেহ একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ যন্ত্র-বিশেষ। কোন যন্ত্রকে দীর্ঘকাল যত্নহীন, অব্যবহারে রাখিয়া দিলে তাহার বিভিন্ন অংশে মরিচা পড়িয়া ধীরে-ধীরে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। মনুষ্যদেহও তেমনি দীর্ঘকাল কর্ম্মবিমুখ করিয়া বসাইয়া রাখিলে নানা ব্যাধির আক্রমণে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং দেহকে সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে ইহার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে যথাবিধি যত্ন ও পরিচালনা করা প্রয়োজন;—আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুনিয়ন্ত্রিত ও বৈধী পরিচালনার নামই হইল ব্যায়াম।

এখানে আমরা নারী জাতির ব্যায়ামের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ব্যায়াম সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞ ও কুশলী ব্যায়ামবিদ্ তাহাদের সাধনা ও অভিজ্ঞতার ফল সমূহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সকল পুস্তক পাঠে নর ও নারী সকলেই আপনাপন স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারেন। আমি সে সম্বন্ধে কিছু বলিব না। আমি আলোচনা করিতে চাই অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক কয়েকটি ব্যায়ামের কথা—যাহা

নাকি মেয়েরা তাহাদের কর্ম্মময় ও বহুবিধ দায়িত্বপুর্ণ জীবনে অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে অনুষ্ঠান করিয়া দেহ ও মন সুস্থ ও সবল রাখিতে পারেন। মেয়েদের গার্হস্থ্য জীবনে নানাবিধ সাংসারিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য এবং জটিল পরিস্থিতির ভিতর-দিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হয়। তখন তাহাদের এমন সময়, সুযোগ বা ইচ্ছা থাকে না যাহাতে তাহারা সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্মের বাহিরে কোন-কিছুর অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদের দেহ-মনের স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করিতে পারেন। এই প্রবন্ধে আমি ধনী পরিবারের নারীগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি না, কারণ তাহাদের সম্মুখে বহু পথ খোলা আছে, বহুরূপেই তাহারা আত্মজীবনের উন্নতি সাধন করিতে পারেন। আমি আলোচনা করিতেছি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের কর্ত্তব্য-ভারাক্রান্ত গৃহলক্ষ্মীদের সম্বন্ধে, যাহাদের কল্যাণ-হস্তের পরিচর্য্যা দেশের বিরাট মধ্যবিত্ত সমাজকে সরস ও প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছে।

শৈশবকালে কুমারী জীবনে বালিকারা প্রায় বালকদের অনুরূপই খেলা-ধূলা ও আমোদ-প্রমোদের মধ্য-দিয়া তাহাদের দেহপোষণী আবশ্যকীয় ব্যায়াম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। খেলা-ধূলার ফাঁকে-ফাঁকে গৃহস্থালীর ছোটখাটো কাজে যতটুকু শারীরিক পরিশ্রম হয় তাহাই তাহাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত।

"কন্যাশ্চাপি রক্ষণীয়া শিক্ষনিয়াশ্চ যত্নতঃ"—কন্যাকেও যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে ও শিক্ষা দিতে হইবে ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। সুতরাং কন্যারও দৈহিক ও মানসিক বিকাশকে সম্পূর্ণতর করিবার জন্য তাহার দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও পেশীর সঞ্চালন যাহাতে সুষ্ঠুভাবে ঘটে

তৎপ্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে গিয়া অনেক অভিভাবক আবার পুত্র ও কন্যার সম-শিক্ষা ও সম-ব্যায়ামের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু বালক ও বালিকার দৈহিক গঠন, সংগঠনী উপাদান এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেকখানি পৃথক। তাই সম-শিক্ষা ও সম-ব্যায়ামে উভয়ে বিকাশের ক্ষেত্রে সম ফল আনিতে পারিবে না। বালিকাগণ ভবিষ্যৎ জীবনে বধূ হইবে, জননী হইবে, গৃহলক্ষ্মী হইবে,—আর এইখানেই তাহাদের নারীত্বের সার্থকতা। সুতরাং তাহাদের দেহ ও মনের বিকাশ এমনতর হওয়া উচিৎ যাহাতে তাহাদের নারীত্ব সার্থক হয়, এবং এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাদের ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি স্থির করিতে হইবে। নতুবা উদ্দেশের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া ছেলেদের মত অনুষ্ঠান করিতে গেলে অবাঞ্ছিত পরিণতির আশঙ্কা আছে।

মধ্যবিত্ত গৃহের কন্যাগণ যত শিক্ষাই লাভ করুক গৃহকর্ম্মে তাহাদিগকে সুশিক্ষিতা করিয়া তোলাকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। কেননা গৃহকর্ম্মে অনভ্যস্তা ও অপারগ হইলে তাহার জীবনই ব্যর্থ হইবে। এইদিক হইতে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, এই সকল মধ্যবিত্ত গৃহের কন্যা ও বধূগণকে এত কর্ম্ম করিতে হয় যে পৃথক ব্যায়ামের আর কোন আবশ্যকতা নাই। কারণ, মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরে মেয়েদের সকাল-সন্ধ্যায় প্রধানতঃ গৃহ মার্জ্জনা করিতে হয়, জল তুলিতে হয় ও বাসন মাজিতে হয়। এই তিনটি কর্ম্মই বেশ শ্রমসাধ্য। ইহাতে হস্ত-পদ চালনা ও ওঠ-বস্ বহু পরিমাণেই করিতে হয়। তাহাতে হাতের, পায়ের, কোমরের অর্থাৎ প্রায় সর্ব্বশরীরের পেশী-

সমূহই কম বেশী পরিচালিত হইয়া থাকে। শরীরে ঘর্ম্ম নির্গত হয়। সর্ব্বশরীরে রক্ত চলাচল দ্রুত হয়। এই কার্য্যগুলি যাহাদের নিয়মিত ভাবে করিতে হয়, তাহাদের সকাল-সন্ধ্যায় যথোপযুক্ত ব্যায়ামই হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামের পুকুর, পাতকুয়া, ঢেকি ও বিস্তৃত গৃহ-প্রাঙ্গণই গৃহলক্ষ্মীদিগকে উপযুক্ত ব্যায়াম করাইয়া লয়। ইহার উপর যদি তাহারা উপযুক্ত আহার পায়, তবে তাহাদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আর কাহাকেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে মেয়েদের পোষাকী ব্যায়ামের মোটেই প্রয়োজন হয় না। দুপুরে ও রাত্রে মেয়েদের রান্না করিতে হয়, পরিবেশন করিতে হয়। ইহাতে তাহাদের ভারি জিনিষ-পত্র উঠানো-নামানো ও ওঠ্-বস্ বহু পরিমাণেই করিতে হয়। তাহার পর তাহারা যদি অবসর সময়ে একটু খোলা হাওয়ায় বেড়াইবার সুযোগ করিয়া লইতে পারে তবে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অতি অল্পই বিপন্ন হইবে।

তাহার পর মেয়েরা যখন মা হয়, তখন তাহাদের ব্যায়ামের আর অভাবই থাকে না। তখন যদি তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর আহার না পায়, অতিরিক্ত ব্যায়ামের দরুণ তবে তাহারা দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। কারণ, দামাল ছেলে সামলাইতে যে কি পরিমাণে ব্যায়াম হয় তাহা প্রত্যেক জননীই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেন। তখন আর তাহারা অন্য কোন ব্যায়ামের কথা চিন্তা করিতেও অবসর বা ভরসা পান না। সামাল-সামাল করিতে করিতেই যে তাহাদের দিন-রাত্রি কোথা দিয়া কাটিয়া যায় তাহা নিজেরাই তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

ইহার পরও ব্যায়ামের প্রয়োজন হইলে অথবা যাহাদের কিছুটা সময় ও সুবিধা আছে, তাহাদের পক্ষে একটু নাচ ও গান শিক্ষা করিলে শ্বাসযন্ত্র ও সর্ব্বাঙ্গের অতি উত্তম ব্যায়াম হয়। গানে শ্বাসের অতি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম হয়। ফুসফুসের যে সকল অংশ সাধারণ অবস্থায় পুরোপুরি ক্রিয়া করে না, গানের সময় শ্বাসের হ্রস্ব-দীর্ঘতার ফলে সে অংশগুলিও ক্রিয়াশীল হয়; আর নাচে ত' সর্ব্বাঙ্গের ব্যায়াম হয়। তাহা ছাড়া ওই বিদ্যাটি মেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে সঙ্গতিহারা ত' নয়ই বরঞ্চ সুসঙ্গত।

আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে—"ধনের ঘরে রূপের বাসা।" কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়—"ধনের ঘরে রোগের বাসা"! বলা বাহুল্য শ্রমহীনতাই ইহার কারণ। ধনীর ঘরে প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্যের সাথে প্রচুর কর্ম্মহীনতার অসঙ্গত যোগাযোগই এই রোগ-প্রবণতার সৃষ্টি করে। যেখানে স্বাস্থ্য নাই সেখানে সৌন্দ-র্য্যের কল্পনা নিতান্তই হাস্যকর। এই জন্যই ধনী গৃহস্থের কন্যা ও বধূগণের পক্ষে সাংসারিক শ্রমসাধ্য ঘর-করনার কর্ম্মের মধ্য-দিয়া আবশ্যকীয় ব্যায়াম করা একান্তই প্রয়োজন।

বিদুষী

'বিদুষী' কথাটি আসিতেছে বিদ্-ধাতু হইতে। বিদ্-ধাতু মানে জানা। জানা কাহাকে বলে, এবং কি প্রকার জানায় বা জ্ঞানে পারদর্শিনী হইলে নারী বিদুষী বলিয়া গণ্যা বা সমাদৃতা হয় আমরা তাহার আলোচনা করিব।

বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিতে অর্থাৎ জীব জগতে জাগতিক ক্রীড়া অব্যাহত রাখিতে গেলে আমরা দুই প্রকার শক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকি। প্রথম শক্তি পুরুষ, দ্বিতীয় শক্তি প্রকৃতি। একটি অপেক্ষাকৃত static—অপরটি dynamic. প্রথমটি আত্মসমাহিত সামগ্রিক শক্তির উৎস, দ্বিতীয়টি সেই অন্তর্নিহিত প্রাণ-প্রাচুর্য্যের বহিঃপ্রকাশ। প্রকৃতি তাই নিত্যচঞ্চলা, লীলাময়ী, নিত্য নবনব অঘটন-ঘটন-পটিয়সী। পুরুষ শক্তির বাস্তব রূপায়ণে প্রকৃতিরূপা নারী শক্তির স্বতঃস্বেচ্ছ আকৃতিভরা কর্ম্মনৈপুণ্যের উপরই সৃষ্টির বনিয়াদ সংস্থাপিত। তাই নারী ধাত্রী, আবার পালয়িত্রীও। নারীর এই ধারণ এবং পালন করিবার ক্ষমতার উপরই সৃষ্টি রক্ষা নির্ভর করিতেছে। অর্থাৎ, পুরুষ-শক্তিকে বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করিবার বিধিদত্ত ক্ষমতা নারীরই। আর, তাহাতেই তাহার সন্তোষ বা তৃপ্তি। ধারণ, পোষণ এবং পালনোপযোগী সমুদয় শিক্ষায় যখনই নারী সম্যকরূপে সুশিক্ষিতা হয়—যখনই নারীচরিত্র উন্মেষক জ্ঞান বা বোধের দ্বারা নারীর শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে, তখনই নারী বিদুষী বলিয়া মান্যা হইবার যোগ্যা হয়। অর্থাৎ সেইরূপ শিক্ষাই নারীকে বিদুষী করিতে সক্ষম, যাহাতে

তাহার বৈশিষ্ট্যরাজীর সম্যক স্ফুরণ হইতে পারে।

এখন কি কি নারীর বৈশিষ্ট্য এবং কি প্রকার শিক্ষায় তাহার স্ফুরণ হয় আর কেমন করিয়া সেই বৈশিষ্ট্যরাজীর দ্বারা নারীর জীবনকে অনুরঞ্জিত করিয়া তাহার বাস্তব চলনাকে সংসার বা সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারা যায় আমরা সেই আলোচনা করিব।

নারীর বৈশিষ্ট্যে আছে নিষ্ঠা, ধর্ম্ম, শুশ্রূষা, সেবা, সাহায্য, সংরক্ষণ, প্রেরণা ও প্রজনন। নি—স্থা-ধাতু=নিষ্ঠা। নিষ্ঠার অর্থ নিবিষ্টরূপে থাকা। অর্থাৎ, চিত্তের স্থৈর্য্য বা একাগ্রতা। ইহা নারী-চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। কোন-কিছু হইতে সহজে বিচলিত না হওয়া, একের প্রতি একটা সহজ ও স্বাভাবিক অস্খলিত অনুরক্তি নারী-চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। তাই নিষ্ঠা অর্থাৎ চিত্ত-সংযম ও একাগ্রতা যাহাতে নারীর জীবনে অটুট ও অব্যাহত থাকে তাহা জীবনের প্রারম্ভ হইতেই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এই নিষ্ঠাই নারী-জীবনে উন্নতির প্রথম ও প্রধান সোপান। ইহার সাহায্যে উত্তর জীবনে সে কল্যাণীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিতা হইতে পারে। কারণ, শ্রেষ্ঠের প্রতি অস্খলিত নিষ্ঠা মানুষকে সর্ব্বপ্রকারে উৎকর্ষের অধিকারী করিয়া তোলে।

ধৃ-ধাতুর অর্থ ধরিয়া থাকা। অর্থাৎ, যাহা বাঁচায় ও বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাই ধর্ম্ম। নারী ধাত্রী ও পালয়িত্রী। ধারণ ও পালনের প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা ও দায়িত্ব নারীর। তাই ধর্ম্ম নারীর বৈশিষ্ট্য।

জীবনের গোড়া হইতে নারী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাকে সচেতন করিয়া তোলা নারীর শিক্ষার একটি প্রধান ও অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে গণ্য হওয়া উচিত।

নারী স্বভাবতঃই কোমলা ও স্নেহশীলা। তাহার অন্তর সহজ-নম্য ও অনুকম্পাশীলা। তাই শুশ্রূষা, সেবা ও সাহায্য নারীর স্বাভাবিক কর্ম্ম। ইহা তাহার অন্তরের জিনিষ। ইহা তাহার আত্ম-প্রকাশের সহজ পথ।

"রোগে শান্তি, দুঃখে দয়া
শোকেতে সান্ত্বনা ছায়া
দিদি এই ধরাতলে রমণীর বুক
এতাধিক রমণীর আছে কিবা সুখ ?"

ইহাই নারীর অন্তরের ভাষা, প্রাণের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভি-ব্যক্তি। নারীর জীবনের সত্যিকারের তৃপ্তি ও সন্তোষ আসে তখনি যখন সে উপলব্ধি করে, তাহারই করুণা বা দাক্ষিণ্যের উপর কাহারও অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে—কেহ একান্তরূপে তাহারই উপর নির্ভরশীল বা শরণাপন্ন; আর সেই আশ্রিত বা বিপন্নের সেবা-শুশ্রূষা বা সাহায্য দানের ভিতর-দিয়া পায় সে তৃপ্তি, আসে তার জীবনে সার্থকতা। তাই মাতৃত্ব নারীর চরম ও পরম কামনা বা সাধনার ধন। আর, তাহার প্রাপ্তিতেই তাহার বাসনার পরিতৃপ্তি এবং দেহ-মনের পরিপূর্ণ প্রশান্তি।

কিন্তু এই সেবা, শুশ্রূষা বা সাহায্যের প্রবৃত্তি নারীর স্বাভাবিক হইলেও ইহার উৎকর্ষ শিক্ষা-সাপেক্ষ। সেবা কাহাকে বলে এবং

কেমন করিয়া সেবা করিলে সেবাগ্রহণকারীর তাহা জীবন ও বর্দ্ধনের অনুকূল হয়, কি প্রকার সেবায় তাহার দেহ ও মনের তৎকালিক স্বাস্থ্যের উপযোগী ও কল্যাণকারক, তাহা অনুসন্ধিৎসা বা দরদের সহিত একান্ত অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষণীয়। এই শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীণতার উপর নারী-জীবনের পূর্ণতা অনেকাংশে নির্ভরশীল।

সমাজ-জীবনে বা সংসার-জীবনে সদাসর্ব্বদা আমরা দেখিতে পাই—পুরুষ করে আহরণ, আর নারীর কার্য্য হইল সেই আহরিত দ্রব্যসামগ্রীর যথাযথ সংরক্ষণ। এই সংরক্ষণ-পটুতা নারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নারীর এই সংরক্ষণ-পটুত্বের উপর সংসারের শ্রী বা সমৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভরশীল। আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবার শিক্ষা বা অভ্যাসের উপর সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য বা শান্তি নির্ভর করে। সংসারে পুরুষ যতই আহরণপটু বা উপার্জ্জনক্ষম হউক না কেন, নারী যদি তথায় উপযুক্তরূপে গোছাল-স্বভাব বা হিসাবী না হয়, সংসারের স্বচ্ছলতা বা স্বাচ্ছন্দ্য সেখানে অসম্ভব। তাই ঈষৎ কৃপণতা নারীর দোষ না হইয়া তাহার গুণ বলিয়াই গণ্য হয়। সংসার নারীর প্রধান কর্ম-ক্ষেত্র। ইহা তাহার চরিত্রের গুণরাশি বিকাশের উপযুক্ত স্থান। তাই জীবনের গোড়া হইতেই সংসার পরিচালনোপযোগী যাবতীয় শিক্ষায় মেয়েদের শিক্ষিতা করিয়া তোলা প্রয়োজন। পুঁথিগত শিক্ষা অর্থাৎ স্কুলকলেজের শিক্ষায় মেয়ে যতই কৃতিত্ব অর্জ্জন করুক না কেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত সংসার পালন বা পোষণোপযোগী বিদ্যায় পার-দর্শিনী সে না হইতেছে ততক্ষণ তাহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ। তাই, তত-ক্ষণ সে বিদুষী নামের অযোগ্যা। বাহিরের জ্ঞানের সহিত সাংসারিক

জ্ঞানের সংমিশ্রণেই নারীর জ্ঞানের পূর্ণতা, আর তখনই সে হয় প্রকৃত বিদুষী!

জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে মানুষের জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। ইহাদের একটিকে হারাইলেও মানুষ আর মানুষ থাকে না, সে ধীরে-ধীরে মনুষ্যত্বের ক্ষেত্র হইতে নামিয়া পড়ে। মানুষের জীবন বর্দ্ধনকারী এই ত্রিধারার উৎস হইল নারী। জীবনের প্রারম্ভ হইতেই মানুষ নারীর হাত হইতে তাহার প্রাণ-পোষণীয় যাবতীয় উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকে। শিশু মাতার নিকট হইতে তাহার সমুদয় প্রয়োজন ও ঔৎসুক্যভরা প্রশ্নের পরিপূরণ ও সমাধান আশা করে। শিশুকাল হইতে ধীরে-ধীরে সে তাহার জ্ঞানভাণ্ডার প্রধানতঃ জননীর দাক্ষিণ্যেই ক্রমে-ক্রমে পূর্ণ করিয়া তোলে। আর, তাহাই হয় তাহার ভবিষ্যৎ চরিত্রের মূল বনিয়াদ। আবার, শিশুর সমস্ত কার্য্য বা চলনার উৎসাহ বা প্রেরণা মাতাই যোগান। জননীর মুখে বাহবা না পাইলে তাহার সব চলনাই হতভম্ব হইয়া পড়ে। জননীই শিশুর সমস্ত শক্তি বা প্রেরণার উৎস। আবার, উত্তর-জীবনে শিশু যখন যুবা হয় তখন তাহার কার্য্যে প্রেরণা যোগায় বধূ। বধূরই স্মিতহাস্যস্ফুরিত উৎসাহব্যঞ্জক অনুপ্রেরণায় পুরুষ তাহার দৈনন্দিন কর্ত্তব্যরাশি অনায়াসেই সুসম্পন্ন করিতে পারে। যদি একটি অনুকম্পা-শীল ও উদ্দীপনাময় সদা জাগ্রত হৃদয় পুরুষের প্রতি কার্য্যে প্রেরণা না যোগায়, তাহা হইলেই জীবনের কর্ত্তব্যরাশি শুষ্ক বোঝা হইয়া তাহার শ্বাসরোধ করে। আর, এই প্রেরণা যোগায় নারীর বৈশিষ্ট্য। নারী যাহাকে ভালবাসে, যে তাহার প্রাণাধিক প্রিয়, তাহার প্রতি

কার্য্যে প্রেরনা যোগান বা উৎসাহ দান নারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ইহাতেই তাহার তৃপ্তি ও আনন্দ। কিন্তু নারীর এই স্বাভাবিক বৃত্তিকেও শিক্ষা ও যত্নের দ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিমার্জ্জিত করা দরকার। কখন কি প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, মনের কোন অবস্থায় কেমন ব্যবহার মানুষ প্রত্যাশা করে, কেমনভাবে চলিলে প্রিয়জনের কাছে তাহা প্রাণদ ও উৎসাহব্যঞ্জক হয়, তাহা প্রত্যেক মেয়েরই যত্নের সহিত অনুধাবন করিয়া শিক্ষা করা প্রয়োজন। মনোবিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এই শিক্ষা যে-মেয়ের জীবনে যত সম্পূর্ণ, তাহার পারিবারিক জীবনও তত মধুময় ও সার্থক। মন বুঝিয়া চলিতে পারার ক্ষমতা মেয়েদের কম-বেশী স্বাভাবিক হইলেও ইহার উৎকর্ষের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার দরকার।

মেয়েদের আর-একটি প্রধান স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইল মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। তাই প্রজনন নারীর বৈশিষ্ট্যরাজির মধ্যে অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই প্রবৃত্তির প্রেরণাতেই নারীর সমস্ত জীবন কম-বেশী পরিচালিত হয়। আর, এই আকাঙ্ক্ষার সুষ্ঠু পরিপূরণের উপরই তাহার জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে। নারীর দেহ-মনের স্বাস্থ্যও এই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির উপর নির্ভরশীল। নারী মাতা হয়। তাই মাতৃত্বের পরিপোষণী যাবতীয় শিক্ষায় নারীকে শিক্ষিতা করিয়া তোলা প্রয়োজন। সন্তান-ধারণের পূর্ব্বে নারীর দেহ-মনের প্রস্তুতির দরকার। যেমন বীজ বপনের পূর্ব্বে ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, তেমনি সন্তান ধারণের পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রকারে মাতাকেও প্রস্তুত হইয়া উঠিতে হয়। উৎকৃষ্ট বীজ হইতে তদনুপাতিক উৎকৃষ্ট ফল পাইতে হইলে ক্ষেত্রকে

বিধিমাফিক সেই বীজের পরিপোষণীয় ও পরিবর্দ্ধনীয়রূপে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। নতুবা সমস্ত শ্রমই বৃথা হয়। কেবলমাত্র বীজকে অঙ্কুরিত করাতেই ক্ষেত্রের কর্ত্তব্য সীমাবদ্ধ নহে। অঙ্কুরে বীজের যাবতীয় গুণ সুসমঞ্জসরূপে ফুটাইয়া তোলা, প্রকৃতি হইতে সেই অঙ্কুরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-পরিপোষণী উপাদান সংগ্রহ করিয়া অঙ্কুরের জীবন ও বর্দ্ধনের অনুকূল করিয়া পরিবেশন করার দায়িত্বও ক্ষেত্রেরই। যাবৎ বৃক্ষ জীবিত থাকে তাবৎ ক্ষেত্রই তাহাকে কত স্নেহে, কত মমতায় বক্ষে আঁকড়াইয়া ধরিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে তাহার যাবতীয় জীবন-বর্দ্ধনীয় রস বা উপাদান সরবরাহ করিয়া থাকে। মাটিই জননী। সন্তান সৃজনে ও সন্তান পরিপালনে জননীর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য তাই সুদূরপ্রসারী ও অপরিসীম। সুসন্তান মানব জীবনের পরম সম্পদ। দেশ ও জাতিরও ইহা পরম কামনার সামগ্রী। সুসন্তান জাতির ভবিষ্যৎ—জাতির মেরুদণ্ড। তাই সমগ্র দেশ বা জাতি অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়াই নারীর নিকট হইতে সুসন্তান দাবী করে। নারীই জাতির সে মহান দাবী পরিপূরণে সমর্থা—যদি সে উপযুক্ত-রূপে শিক্ষিতা হয়। জগৎস্রষ্টার মহান উদ্দেশ্য নারীর মাতৃরূপেই সম্পূর্ণতা লাভ করে। সৃষ্টি, স্থিতি ও পালয়িত্রী নারী। সম্পূর্ণভাবে নারীর শিক্ষা ও নৈপুণ্যের উপরই নির্ভর করে মানুষের জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণতা ও সর্ব্বসার্থকতা। সন্তানের শারীরিক ও মানসিক গঠনের পরিমাপ সাধন একমাত্র মাতারই কৃতিত্ব। তাই, নারী জন্ম ও জাতির নিয়ন্ত্রী। মনু বলিয়াছেন—মাতা পিতা হইতে সহস্রগুণে গরিয়সী। পিতা হইতে শিশু তাহার বংশানুক্রমিকতা ও সহজাত সংস্কার সকল

লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার সেই বংশানুক্রমিকতা ও সহজাত সংস্কাররাজি তাহার জীবন ও বর্দ্ধনের অনুকূল করিয়া সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ করিবার দায়িত্ব মাতারই।

তাই, মাতার শিক্ষা ও চরিত্র যে কতদূর উপযুক্ত ও নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। পুরুষের শিক্ষা হইতে নারীর শিক্ষার এইখানেই তফাৎ। নারীকে গৃহের কর্ত্রী হইতে হইবে—সন্তানের জননী হইতে হইবে, তাই বাহিরের শিক্ষা অর্থাৎ স্কুল-কলেজের শিক্ষা তাহাকে যতই উন্নত করুক না কেন গৃহিণী হইবার শিক্ষা—মাতা হইবার নৈপুণ্য যদি তাহার না থাকে—তাহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও নিরর্থক অতি নিশ্চয়। সেরূপ শিক্ষা তাহার নিজের জীবনে ও জাতির জীবনে কোন কল্যাণই আনিতে পারিবে না। তাই, এরূপ শিক্ষিতা মেয়ে বিদুষী নামেরই অযোগ্যা। কারণ, বাহিরের কাজের জন্য পুরুষই যথেষ্ট, সেখানে নারীর অনুপ্রবেশ বিশেষ প্রয়োজন হয় না। নারীর প্রয়োজন গৃহে—গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে। গৃহের উপযুক্তা হইয়া দেশ ও জাতির শ্রদ্ধার পাত্রীরূপে তাহাকে গড়িয়া উঠিতে হইবে। তখন নর ও নারী উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দী না হইয়া, হইবে পরিপূরক, সানুকম্পী সহায়ক। দেশ হাসিয়া উঠিবে তাহার পূর্ব্ব গৌরব ও ঐতিহ্যের পুনরাবির্ভাবে।

সতীত্ব

যাহা বাঁচিয়া থাকে ও দীপ্তি পায় তাহাই সৎ। আর, কেহ বাঁচিয়া আছে তখনই বলিব যখন সে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত হইয়া দীপ্তিময় জীবন যাপনে সমর্থ হইয়াছে। যাহার জীবনের দীপ্তিতে ও ঔজ্জ্বল্যে, যাহার সংস্পর্শে আগত প্রতি প্রত্যেকের জীবনই অল্পবিস্তর দীপ্তিময় বা আলোকিত হইয়া ওঠে—অন্ততঃ হইবার আকৃতি জানায় —বাঁচিবার অধিকার পূর্ণমাত্রায় কেবল তাহারই আছে বলিব। আর, তাহাকেই সৎ বলিয়া অভিহিত করিব।

আমরা এখন নারীজাতির সতীত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। সতীত্ব কাহাকে বলে? সতীত্বের উপযুক্ত সংজ্ঞা কী? ব্যষ্টি জীবনে বা সমষ্টি জীবনে, সমাজ জীবনে বা রাষ্ট্র জীবনে সতীত্বের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু; সতীত্ব নারী-জীবনকে সুখ, শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দ দেয় অথবা ইহা নারী জীবনের একটি বহু প্রাচীন কুসংস্কার মাত্র? ইহাকে বিসর্জ্জন দিয়া জীবনকে পরিপূর্ণভাবে সুষমামণ্ডিত করিয়া গড়িয়া তোলা কি সম্ভব? প্রাচীন ভারতের মনীষীগণ নারী-জীবনে সতীত্বকে এত গুরুত্ব বা প্রাধান্য দিয়াছেন কেন? কী ইহার তাৎপর্য্য?

নারীর বাঁচিয়া থাকা ও দীপ্তি পাওয়া বলিতে আমরা কী বুঝি? কিসে নারী বাঁচিয়া থাকে? কিসে তাহার জীবন শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দে উচ্ছল হইয়া স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ গতিতে স-পারিপার্শ্বিক তাহাকে অমৃতের অধিকারিণী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে? যে নিজের জীবনে সুখ শান্তির স্বাদ পায় না, সে স্বভাবতঃই অপরকে

সুখ, শান্তি ও তৃপ্তি দিতে পারে না। যাহার জীবন মরুভূমির মত নীরস ও অতৃপ্ত, তাহার সংস্পর্শে গেলে দেহে-মনে জ্বালাই কেবল অনুভূত হয়, তৃপ্ত হওয়া যায় না। তাই নারীর সাহচর্য্যে তৃপ্তি পাইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দেখিতে হইবে নারী কী চায়। কিসে তাহার জীবন স্বাভাবিক ও অব্যাহত হয়। তবেই নারী হইতে তাহার গৃহ, সমাজ ও দেশ জীবনবৃদ্ধির যাহা কিছু আবশ্যকীয় উপাদান তাহা লাভ করিতে পারিবে।

"Man's love is of man's life a thing apart. 'Tis woman's whole existence."—পুরুষের জীবনে বহুমুখীন কর্ত্তব্যের দায়িত্ব আছে, বাহির বিশ্বে তার সুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র, জীবনের অধিকাংশ সময় তাহাকে বাহিরে কাটাইতে হয়, বাহির জীবনেই সে বেশী অভ্যস্ত। গৃহ তাহার অবসর বিনোদনের স্থান। তাই ভালবাসা না পাইলে পুরুষের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা যদিও বা সম্ভব, নারীর পক্ষে প্রেমহীন জীবন যাপন করা একপ্রকার অসম্ভব। ভালবাসাহীন জীবন তো নারীর নিকট অভিশাপ-স্বরূপ!

'Love is woman's whole life.' নারীর সমস্ত জীবন ভালবাসাময়। নারী ভালবাসা চায়, ভালবাসা দেয়—ভালবাসাই নারীজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং নারীকে বাঁচাইতে হইলে, তাহা হইতে জাতির বাঁচিবার উপাদান সংগ্রহ করিতে হইলে, নারী-জীবনের মূলে প্রেমবারি সিঞ্চনের প্রয়োজন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন-পোষণীয় প্রেম নারী কোথা হইতে পায় আমরা দেখিব।

নারী-জীবনে চরম ও পরম কামনার সামগ্রী হইল স্বামী-প্রেম।

স্বামী-প্রেম লাভে নারী যদি তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়, বাহিরের শত-সহস্র বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করিয়াও সে তাহার পারিপার্শ্বিকে জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্পন্দন জাগাইতে পারে—সংসার-জীবনে কল্যাণ আনিয়া তাহার কল্যাণী নাম সে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে। স্বামী-প্রেম অতৃপ্তা নারী পার্থিব কোন সম্পদ দিয়াই তাহার হৃদয়ের ক্ষত নিরাময় করিতে পারে না। অন্য কোন ভালবাসার দামও তাহার কাছে নিরর্থক, অসার—অপ্রয়োজনীয়। তাই পুত্রবতী বিপুল বিত্তশালিনী নারীও যদি বিধবা হয়, সে হয় অনাথিনী—দুর্ভাগিনী।

স্বামী নারীর অস্তিত্ব। স্বামী-প্রেম নারীর প্রাণ-প্রবাহ। স্বামীকে বলে 'বর'। 'বর' কথার অর্থই বরণীয়, যিনি যে-নারীর নিজের ও তাহার পিতৃপুরুষগণের শ্রদ্ধেয় ও বরণীয়। তিনিই সে-নারীর বর হইবার যোগ্য। তাই নারী হইতে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ পুরুষই সেই নারীর স্বামী হইতে পারে, আর সেই স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ সর্ব্বস্ব উজাড়-করা প্রেমই নারীকে করিতে পারে উন্নত ও কল্যাণ-প্রসবিনী। কারণ, শ্রেষ্ঠের প্রতি সহজ ভক্তি ও ভালবাসা হইতে মানুষ যখন কর্ম্মপরায়ণ হইয়া ওঠে, তখনই তাহার মধ্যে সত্যিকারের উৎকর্ষ জন্মে। আর, তাহা ভালবাসাপ্রসূত বলিয়া, সত্তা হইতে স্বতঃ-উৎসারিত বলিয়া তাহা চরিত্রেরই নিজস্ব সম্পদ। তাই এই প্রকার উৎকর্ষ মানুষের জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া উন্নতিতে অবাধ করিয়া তোলে। আর, শ্রেষ্ঠের প্রতি আসক্তিতে মস্তিষ্কে একটা টান লাগিয়া থাকে। তাহারই দরুণ মানুষের মস্তিষ্ক বিশেষভাবে সাড়াপ্রবণ ও গ্রহণক্ষম হয়। সত্যিকারের ভালবাসা জন্মিলেই, প্রেমাস্পদের

অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে; আর এই প্রেমাস্পদ যদি হয় সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ তবে মানুষ স্বভাবতঃই অতি সহজেই উন্নতিকে আলিঙ্গন করিতে পারে, তখনই তাহার মধ্যে সৎভাব অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। এইরূপ প্রেম যদি একনিষ্ঠ ও অস্খলিত হয় নারী তখনই হয় সতীপদবাচ্য। ইহা অতসী কাচের ন্যায় জীবনকে আলোকিত করেই, তখন তাহার সান্নিধ্যে আগত জনও তাহা হইতে জীবনীয় উপাদান লাভ করিতে সক্ষম হয়। তাই সতীত্বকে নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়াই মনীষীরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পতি যাঁহার প্রার্থনীয়, পতিকে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করাই যাঁহার সাধনা—পতিকে জড়াইয়া যিনি জীবন ধারণ করেন তিনিই পতিব্রতা বা পতিপরায়ণা। পতির যে-কোন চলনা বা মতকেই যে স্ত্রী আন্তরিক-ভাবে সমর্থন করে বা মানিয়া চলে, অন্ততঃ বাধা দেয় না, তাঁহার সৎ-অসৎ কোন পথেরই যে অন্তরায় হয় না, বরং সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করে, এমন কি প্রয়োজন হইলে স্বামীর যে-কোন প্রবৃত্তি পরিতৃপ্তির জন্য হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও যে কুণ্ঠিত হয় না, পাতিব্রত্য তাঁহাতেই সার্থক হইয়াছে।

কিন্তু সতী ও পতিব্রতায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। সতী কখনো স্বামীর অন্যায় বা অসৎ কর্ম্মকে সমর্থন করে না—সাহায্য করা তো দূরের কথা। স্বামীর জীবন ও বৃদ্ধির যাহা প্রতিকূল, সতী নারী প্রাণ থাকিতেও তাহা সমর্থন করিবে না; স্বামীর উন্নতির জন্য, স্বামীর প্রতিষ্ঠার জন্য, স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করিতেও সতী নারী পরাঙ্মুখ হয় না। ইহাই সতীত্বের বৈশিষ্ট্য। সতীত্বের পরম ও চরম

বিকাশ আমরা দেখিতে পাই দক্ষরাজ দুহিতা উমার চরিত্রে। সতীরাণী নাম তাহারই সার্থক। স্বামীর প্রতিষ্ঠার জন্য, বাহির বিশ্বে স্বামীকে প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি স্বামীর ইচ্ছাকে গ্রহণ করেন নাই, যে পতিকে লাভ করিবার জন্য তিনি প্রাণ তুচ্ছ করিয়া কঠোর সাধনায় দেহ ক্ষয় করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন সেই প্রাণসর্ব্বস্ব পতিকে অমান্য করিয়া, তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য দেহত্যাগ করিয়া ভারতের দিকে-দিকে বাহান্ন পীঠের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতে ভারতে পুরুষের আদর্শ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর। আর, নারীর আদর্শ হইল সতীরাণী উমা।

সতী নারীর সমস্ত বৃত্তি স্বামীতেই সমাহিত, স্বামীতেই সার্থক, স্বামীর সান্নিধ্য বা স্বামীর তৃপ্তি ব্যতিরেকে কোন প্রবৃত্তির অস্তিত্বই সে অনুভব করে না। বৃত্তিগুলি একমুখীন বলিয়া সেগুলি হয় সতেজ ও স্বাভাবিক ; আর তাহা সমাজ ও সংসারের কল্যাণই প্রসব করে, তাই সতীত্ব নারীর ধর্ম্ম। ইহার উপরেই তাঁহার নিজের উৎকর্ষ, সামাজিক উৎকর্ষ তথা সমগ্র দেশের জীবন ও বৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে।

নারী—হেঁসেলে

জীবমাত্রই দেহ ও মনের অধিকারী। আর, সেই দেহ ও মন পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। একের শুভাশুভের উপর অপরের শুভাশুভ সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। দেহ যদি অসুস্থ হয় সঙ্গে সঙ্গে মনও কম-বেশী পীড়িত হইয়া পড়ে—ইহা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার—স্বতঃ-সিদ্ধ। আবার, মন অসুস্থ হইলে দেহেও আমরা পীড়া বোধ করি—সমস্ত দুনিয়াই বিস্বাদ ও বিরস হইয়া উঠে।

আর, এই মনের অভিব্যক্তি বা মনের আত্মপ্রকাশ ক্ষুদ্র প্রাণী অপেক্ষা মানুষের মধ্যেই বেশী প্রকট। জীবজগতে কীট-পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিটি চেতন প্রাণীরই স্ব স্ব ভাষা বর্ত্তমান। আর, তাহাদের সেই ভাষার সাহায্যে অথবা আকার ইঙ্গিতের দ্বারা তাহারা আপনাপন মনের ভাব বা আশা-আকাঙ্খা প্রকাশ করিয়া থাকে—সাধারণ মানুষ নিজের অজ্ঞতার বা অক্ষমতার দরুণ সে ভাবের সহিত সম্যক পরিচিত নহে। আমরা মানুষ, আমরা সাধারণতঃ মানুষের ভাবের সহিতই কম-বেশী পরিচিত। তাই আমরা এখানে মানুষের সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

মানুষকে ভালভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে—এ জগতের সুখ-শান্তি ভোগ করিতে হইলে, তাহার দেহ ও মনের স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখা প্রয়োজন। জাগতিক ক্ষয় ও ক্ষতিকে পূরণ করিতে হইলে চাই উপযুক্ত পুষ্টির সংস্থান; আর, এই প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাই আমরা আমাদের আহার্য্য হইতে। এখন, কি প্রকার ও কতটুকু

খাদ্য কখন এবং কি রকম ভাবে গ্রহণ করিলে আমাদের জীবন-বর্দ্ধনের পক্ষে তাহা অনুকূল হইবে? আর কে-ই বা তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে? কে আমাদের মনের সম্মুখে, মুখের সম্মুখে আমাদের অত্যাবশ্যকীয় জীবনীয় আহার্য্য তুলিয়া ধরিতে সক্ষম? কাহার চোখে সস্নেহ সানুকম্প অমৃত নিঃসরণী দৃষ্টি আমাদের মনের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিতে পারে? কাহার হাতের স্বতঃস্বেচ্ছ দরদভরা সত্তাপোষণী আহার্য্য পরিবেশনে আমাদের দৈহিক ক্ষুধার পরিসমাপ্তি ঘটাইতে পারে? তাহা নির্দ্ধারণ করার চেষ্টাই হইবে আমাদের এই আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

এই জগতের সহিত প্রথম পরিচয়ের দিনে যিনি আমাদের চেতনার জগতে সর্ব্বপ্রথম প্রকটিতা হন তিনি আমাদের জননী। জননীর নিরলস, অনুসন্ধিৎসু, স্নেহলদীপ্ত পরিচর্য্যা আমাদের সকল চাহিদার সর্ব্ব প্রয়োজনের যথোপযুক্ত পরিপূরণে সমর্থ। জননীর প্রজ্ঞাই কেবল বুঝিতে পারে তাহার শিশুর কখন কি প্রয়োজন। কিসে শিশু শারীরিক ও মানসিক উভয় দিকে সুস্থ থাকিবে, নিঃসন্দেহে তাহা শিশুর জননীই বেশী বুঝেন। কি প্রকার খাদ্য, কতটুকু এবং কখন শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশী উপযোগী, তাহা শিশুর জননী ব্যতীত আর কে বুঝিতে সক্ষম? তাই, অতি শৈশবকাল হইতেই শিশু তাহার জননীর হাত হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই জগদীশ্বর জননীর বুকে শিশুর জীবনীয় আহার্য্য সঞ্চিত করিয়া রাখেন। ভগবানই শিশুর আহার্য্য পরিবেশনের সমস্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতা জননীর করে অর্পণ করিয়াছেন। ভগবৎ-প্রদত্ত

এই মহান কর্ত্তব্যের দায়িত্ব জননী যদি নিষ্ঠার সহিত আজীবন প্রতিপালন করিয়া যান, তাঁহার সন্তানের দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের দ্যুতিতেই তিনি তাঁহার উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিবেন—ইহা অতি নিশ্চয়।

"স্বাস্থ্য ক্ষিধে বুঝে তবে
ছেলেপুলের খাদ্য দিবি
ও না হ'লেই জানিস সেধে
রোগের পূজোয় দিন যাপিবি।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর

তাই সন্তান-সন্ততির স্বাস্থ্য, ক্ষুধা ও রুচি যত্নের সহিত অনুধাবন করিয়া নিপুণতার সহিত আহার্য্যের ব্যবস্থা করা মাতারই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য। সে-ক্ষেত্রে তিনি অন্য কাহারও উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে আশানুরূপ সুফল পাইবেন না। বাহিরের লোক তো দূরের কথা, মাতা ব্যতীত অপর কোন নিকট আত্মীয়ও সব সময় শিশুদের রুচি ও স্বাস্থ্য বুঝিয়া আহার্য্য পরিবেশন করিতে সমর্থ হন না। আর, শিশুরাও মাতার হাতে খাইতে পাইলেই বেশী তৃপ্তি ও সন্তোষ বোধ করে, আর তাহাতেই তাহাদের দেহ ও মনের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকার সম্ভাবনা।

তাহার পর শিশু ধীরে-ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিয়া সে ক্রমে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হইয়া দাঁড়ায়। উত্তরকালে তাহার জীবনে বধূর আগমন ঘটে। শ্বশ্রূমাতা ধীরে-ধীরে তাহার পুত্রবধূকে সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্যে নিজের সহায়করূপে গড়িয়া তোলেন। সংসারের প্রতিটি প্রাণীর স্বভাব, রুচি ও শারীরিক ও মানসিক ভাবধারার

সহিত বধূ ক্রমে-ক্রমে পরিচিতা হইয়া উঠে। তখন বধূই ধীরে-ধীরে হইয়া দাঁড়ায় সংসারের কর্ত্রী ও পালয়িত্রী। স্বামী বধূর প্রিয়তম, স্বামীর পরিজনেরা তাহার প্রিয়তর আত্মীয়। তাহাদের জীবন ও বর্দ্ধন তাহার স্বার্থ। স্বামী ও স্বামীর প্রিয় পরিজনেরা যাহাতে সুস্থ থাকে বধূ স্বভাবতঃ তাহার জন্য যত্নবতী হয়। আর, ভালবাসার ধর্ম্মই হইল প্রিয়কে নিজের হাতে পরিচর্য্যা করিয়া তৃপ্ত হওয়া। ভালবাসার পাত্রের সেবাশুশ্রূষার ভার অপরের হাতে ন্যস্ত করিলে প্রাণে কিছুতেই তৃপ্তি বা শান্তি আসে না, মনও কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। নিজের হাতে প্রিয়র সকল চাহিদা বা প্রয়োজনের নিখুঁত পরিপূরণ করিতেই মনের প্রশান্তি লাভ ঘটে—ইহাই ভালবাসার বৈশিষ্ট্য। তাই, নারী আপন অন্তরের প্রেরণাতে স্বতঃস্বেচ্ছভাবে প্রিয়-পরিচর্য্যা বা সেবার ভার আপন হস্তে গ্রহণ করে। আর, তাহাতেই তাহার প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি। 'নারি'-ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি পাওয়ানো। বৃদ্ধি পাওয়ানোই নারীর বৈশিষ্ট্য, আর তাহাতেই তাহার প্রকৃত তৃপ্তি। বৃদ্ধি পাইতে হইলে অথবা বাঁচিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম আমাদের প্রয়োজন উপযুক্ত আহার। তাই উপযুক্ত আহার্য্য প্রস্তুত ও তাহার যথোপযুক্ত পরিবেশনের সমস্ত দায়িত্ব নারীর হাতে ন্যস্ত হওয়াই স্বাভাবিক ও কল্যাণকর। সেই জন্যই সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই নারীর হাতেই হেঁসেল অর্থাৎ রান্নাঘরের প্রকৃত দায়িত্ব অর্পণ করিবার বিধান দিয়াছেন। প্রয়োজনবোধে নারী বাহিরের যে-কোন কাজই করুক না কেন, সংসারই তাহার স্বাভাবিক কর্ম্মক্ষেত্র, হেঁসেলই তাহার চারিত্রিক গুণ বা নিপুণতা বিকাশের উপযুক্ত স্থান। সংসার

নারীর সাম্রাজ্য, আর হেঁসেল তাহার সিংহাসন—সেই সাম্রাজ্য ও সিংহাসনের একচ্ছত্র অধিকারী নারী। সেখানে সে-ই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। এই হেঁসেলরূপ সিংহাসনে অধিরূঢ়া থাকিয়া তাহার প্রিয় পরিজনদিগকে আপন কল্যাণ-হস্তে আহার্য্য পানীয় পরিবেশন করিয়া জীবন ও বর্দ্ধনে অব্যাহত রাখিবার বিধিদত্ত দায়িত্ব নারীরই।

আমরা নারী-চরিত্রে দেখিতে পাই অতি শিশুকাল হইতেই তাহারা গৃহিণী সাজিয়া হাঁড়ি, কড়া লইয়া কল্পিত সংসার সাজাইয়া বসে। ধূলো-মাটির অন্নব্যঞ্জন রান্না করিয়া কল্পিত পুত্রকন্যাদিগকে খাওয়াইয়া কতই না তৃপ্তি বোধ করে। তাহার পর আর একটু বড় হইলে তাহারা ব্রতকথাতে দ্রৌপদীর মত রাঁধুনি হইবার প্রার্থনা জানায়। এই সমস্ত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে সংসার ও হেঁসেল নারীর স্বাভাবিক কর্ম্মক্ষেত্র। আর তাহাই তাহার আত্মবিকাশের উপযুক্ত স্থান। পুরাকালে বড়-বড় রাজাদের ঘরেও রাণীরা নিজের হাতে রান্না করিয়া তাঁহাদের স্বামী-পুত্রদের খাওয়াইতেন। প্রাচীন ভারতে বিধি ছিল, গৃহস্থরা নিজেদের পরিবারস্থ মহিলাদের রান্না ছাড়া অপর কাহারও হস্তে অন্ন গ্রহণ করিতেন না।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এই নিয়ম আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। আমরা অনুকরণ-প্রিয় জাতি। পরানুকরণের মোহে আমরা অনেক সময় অপরের ভালটা না লইয়া তাহাদের মন্দটাই বেশী গ্রহণ করিয়া থাকি। ভারত আপন সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে অধুনা সভ্য অন্য অনেক দেশ হইতেই বহু প্রাচীন ও উন্নত। ভারতের ঋষিরা তাঁহাদের

সাধনা-লব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা নর ও নারীর কর্ম্মক্ষেত্র যেভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন একটু অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধা সহকারে তাহার পর্য্যালোচনা করিলেই তাহার পূর্ণাঙ্গ সমীচীনতা সম্বন্ধে মনে আর কোন সংশয় থাকে না। যাহার যেটা প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট স্বাভাবিক কর্ম্মক্ষেত্র নয় সে যদি সেখানে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, স্বভাবতঃই সে সেখানে আশানুরূপ উন্নতি করিতে পারিবে না; তাহার শারীরিক ও মানসিক শান্তিও বিপন্ন হইবে। ইহা আমরা হামেশাই দেখিতে পাই। উপরন্তু তাহাতে সমাজদেহেও নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাই বোধ হয় পাশ্চাত্ত্য নারীদের বহু ক্ষেত্রে Back to the kitchen করিয়া দিয়াছে।

আহার্য্য দ্রব্যের গুণের সহিত অথবা আহার্য্য পরিবেশকের ভাবের সহিত আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আমরা অতঃপর সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। আমাদের স্বাস্থ্য এবং রুচির উপর আমাদের আহার্য্য নির্ব্বাচন নির্ভর করে। সে-সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্য এবং রুচি অনুসারে যে প্রকার খাদ্যই আমরা গ্রহণ করি না কেন সেটা বিশুদ্ধ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে তৈয়ারী হওয়া প্রয়োজন। কারণ, খাদ্য ও পানীয়ের ভিতর-দিয়া যত সহজে আমাদের দেহে দুষ্ট বীজাণু প্রবেশ করিতে পারে, এমন আর কিছুতেই পারে না। সুতরাং যিনি খাদ্য তৈয়ারী করিবেন ও হাতে করিয়া সেই খাদ্য আমাদের মুখে তুলিয়া দিবেন, তাহার হাতেই প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবনের নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে। মানুষের স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান ও খাদ্য-

দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে খাদ্য প্রস্তুতকারীর সবিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকিলে, আহার্য্য-গ্রহণকারীর পক্ষে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। কিন্তু ভালবাসা বা দরদ থাকিলে এই খাদ্যবিষয়ক জ্ঞান বা খাদ্য পরিবেশকের নিপুণতা অর্জ্জন করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। কারণ, খাদ্যগ্রহণকারীর বাঁচা ও বাড়া যদি খাদ্য-প্রস্তুতকারীর স্বার্থ হয়—সে আপন অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসা বলে অতি শীঘ্রই আবশ্যকীয় জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া ফেলিবে। সেই জন্যই মাতা যত সহজে তাঁহার সন্তানের খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করিতে পারেন সচরাচর এমন কেহই বিশেষ পারে না। এই দিক দিয়া বিচার করিলেও নারীর হাতেই হেঁসেলের ভার ন্যস্ত হওয়া সমীচীন বলিয়া বোধ হইবে।

তাহার পর আহার গ্রহণকালে যদি আমাদের মনে কোন অপ্রিয় ভাবের উদয় হয়, অর্থাৎ, আমাদের মন যদি সে সময় কোন কারণে বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে আমাদের খাদ্য পরিপাকে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। আবার, যদি কোন কারণে আমাদের মনে উপস্থিত খাদ্যের প্রতি বিতৃষ্ণা বা ঘৃণার ভাবের উদ্রেক হয়—তাহাতেও আমাদের খাদ্যগ্রহণ সার্থক হইবে না। কিন্তু যিনি আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রিয়, যাহার উপস্থিতি আমাদের কাছে প্রীতিদায়ক ও আকাঙ্ক্ষিত, তাহার দেয় আহার্য্য স্বভাবতঃই আমাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল হইবে। ভালবাসা অমৃত। ভালবাসারূপ পরশপাথর লৌহকে স্বর্ণ করিতে সক্ষম। তাই পাচকের হাতের পরমান্ন মাতা, বধূ বা কন্যার হাতে শাকান্নেরও সমকক্ষ হইতে পারে না।

আবার, মানুষের মনোরাজ্যের ব্যাপার অতি বিচিত্র ও সূক্ষ্ম।

মনোবিজ্ঞানের সহিত যাহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা বুঝিতে পারি-বেন যে আহার্য্য-প্রস্তুতকারীর বা খাদ্য-পরিবেশনকারীর মানসিক ভাবরাশি খাদ্য গ্রহণকারীর মনের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং যাহার সহিত আমাদের কোন নিকট সম্বন্ধ নাই—যে নিতান্তই একজন বাহিরের লোক, যাহার শরীর বা মনের খবর আমরা বিশেষ রাখি না বা রাখিতে পারি না—সেরূপ লোকের হাত হইতে যতদূর সম্ভব খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ না করাই আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গল।

তাই সর্ব্বদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, নারীই যখন ধাত্রী ও পালয়িত্রী, নারীই যখন তাঁহার সন্তান-সন্ততিকে এই পৃথিবীতে আনিয়াছেন, তখন নারীর হাতেই তাহাদের জীবন-বর্দ্ধনের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকা সমীচীন ও কল্যাণজনক। আর প্রকৃতির নির্দ্দেশও তাহাই।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণ

মানবচিত্ত নীড়-প্রয়াসী। কেবল মানবচিত্তই বা বলি কেন? জীব জগতের প্রায় প্রতিটি স্তরেই দেখিতে পাই এই নীড় রচনার প্রয়াস। জীবজগতের এই প্রয়াস চিরন্তন। কিন্তু এখানে আমরা মনুষ্য সমাজের কথাই আলোচনা করিব। মানবসমাজে আবার আমরা দেখিতে পাই, পুরুষ অপেক্ষা নারীরই গৃহ রচনার আগ্রহ অধিক। প্রয়োজনের তাগিদে আর অন্তরের আগ্রহে নারীই গৃহ রচনায় অগ্রণী হয়। আর, নারীর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণবশতঃ, তাহাকে সুখী করিবার আকূতিতে পুরুষের মনেও সেই আগ্রহ বা আকাঙ্খা সঞ্চারিত হয়। তারপর উভয়ের মিলিত চেষ্টায় হয় তাহাদের নীড় রচনা। গড়িয়া ওঠে তাহাদের সুখ-দুঃখের লীলা-নিকেতন। আবার, মানুষ মাত্রেই সুখ-শান্তি কামনা করে। স্ত্রী-পুরুষের মিলিত জীবনে অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনে সুখী হইতে হইলে, শান্তি পাইতে হইলে সুন্দর ও প্রীতিপ্রদ গৃহ রচনার যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন গৃহকে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত করা। এ দায়িত্ব উভয়ের। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মিলিত চেষ্টা ছাড়া সুন্দর ও সুখময় গার্হস্থ্য জীবনের কল্পনা এক রকম অসম্ভব। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অকৃত্রিম বাস্তবধর্ম্মী ভালবাসা বা দরদ, উভয়ের প্রতি উভয়ের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও নির্ভরতা—এইগুলি হইল দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি। উভয়ের মিলিত চেষ্টায় যাহাতে এই ভিত্তি দৃঢ় হয় সে-দিকে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। একজন অপরের পরিপূরক বা সহায়ক। পুরুষ অর্থে যে পূরণ করে, আর নারী (নারয়তি)

অর্থাৎ যে বৃদ্ধি পাওয়ায়। একে অন্যের পরিপূরক। একজন অপর জনের সম-বিপরীত সত্তা। দুই-এ মিলিয়া এক অর্থাৎ অখণ্ড। সংসারকে সুন্দর, স্বচ্ছন্দ ও সচ্ছন্দ করিতে হইলে, অর্থাৎ গৃহকে শ্রী-মণ্ডিত করিতে হইলে উভয়ের দায়িত্ব, আন্তরিকতা ও যত্নই সমান অপরিহার্য্য। তবে পুরুষের বৈশিষ্ট্য আহরণে, আর নারীর বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে। বাহির বিশ্ব হইতে সুখ সুবিধা বা স্বাচ্ছন্দ্য আহরণ করিতে হইলে, বাহির লইয়াই পুরুষকে বেশী ব্যস্ত থাকিতে হয়। গৃহের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে সে কমই মনোযোগ দিতে পারে। আর, নারী গৃহের শ্রীবৃদ্ধির ব্যাপারে মনোযোগ দিতে বেশী পছন্দ করে। তাই নারীকে বলা হয় লক্ষ্মী বা শ্রী। নারীর সহজাত সংস্কারই হইল গৃহকে সুন্দর, সুশ্রী ও স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিয়া তাহার প্রিয়তম পতিদেবতার ও তাহার পরিজনবর্গের তুষ্টি ও পুষ্টি বিধান করা।

"প্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কিঞ্চন।"—(মনু)

কার্য্যান্তে গৃহে ফিরিয়া গৃহের সুস্থ আবহাওয়ায় স্বামী যাহাতে দেহে ও মনে স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিতে পারেন নারীর সুস্থ মনোবৃত্তি স্বভাবতঃই সেদিকে আগ্রহশীল। সে তাহার সেবা, সাহচর্য্য ও আন্তরিকতাপূর্ণ সপ্রেম ব্যবহারের দ্বারা স্বামীর সমুদয় ক্লান্তি ও অবসাদ মুছিয়া লয় বা লইতে চায়। ইহাই স্বাভাবিক আর তাই স্বাস্থ্যপ্রদও। ইহার বিপরীত অবস্থা যেখানে, সেখানে হইয়াছে দাম্পত্য-জীবনের শোচনীয় অপমৃত্যু।

আবার, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সেতু হইল সন্তান। পতি-পত্নীর মিলিত একক জীবনে দীর্ঘ দিন সন্তানের আবির্ভাবের অভাবে অশান্তি

ও অতৃপ্তি দেখা দেয়। জীবন যেন বৈচিত্র্যহীন নীরস বলিয়া মনে হয়। সবই যেন শূন্য খাঁ-খাঁ মরুভূমির মতই বোধ হয়। আর এ রকম অবস্থা পুরুষ অপেক্ষা নারীরই হয় বেশী। কারণ, মাতৃত্বের আকাঙ্খা নারীর সহজাত সংস্কার। Nature has so constituted woman that her creative power and yearning centre primarily on the forming of a child, and so long as woman is woman it must remain so".—Havelock Ellis.

তাই, মা হইবার জন্যই প্রধানতঃ নারীর জন্ম ও জীবন। সমস্ত মাতৃত্বের উপযোগী উপাদানে দেহে ও মনে সজ্জিত হইয়া নারী জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং মা তাহাকে হইতেই হইবে। মাতৃত্বেই তাহার চরম পরিণতি এবং পরম বিকাশ। সমস্ত জীব-জগৎ নারীর এই মাতৃমূর্ত্তির পাদপীঠতলে মাথা নত করিয়া ধন্য হয়, কৃতার্থ হয়।

"The Madona conception expresses man's highest comprehension of a woman's character".—G.S.Hall.

নারী তাই জননী, ধাত্রী ও পালয়িত্রী।

অপর ক্ষেত্রে, পুরুষের হইল বহির্মুখী প্রতিভা। বাহিরের কাজে-কর্ম্মে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, দিনরাত্রির অধিকাংশ সময় পুরুষকে গৃহের বাহিরে অতিবাহিত করিতে হয়। তাই সেই দিকেই তাহাকে ঝোঁক ও মনোযোগ অধিক দিতে হয়। গৃহের প্রতি সেই জন্যই সাধারণতঃ এবং মুখ্যতঃ সে নির্লিপ্ত ও উদাসীন। তাই সন্তানের অভাব তাহাকে অতটা উতলা বা ব্যাকুল করিয়া পীড়া দিতে পারে না। কিন্তু বংশানুক্রমিকতার জন্য এবং বার্দ্ধক্যের অবলম্বন ও ভরসা হিসাবে

পুরুষও সন্তানের কামনা করিয়া থাকে। তাহা ছাড়াও কচি-কচি মুখ, আধ-আধ বুলি, নতুন প্রাণের কলকল্লোল স্বভাবতঃই গৃহকে প্রাণবন্ত ও সুষমামণ্ডিত করিয়া রাখে। ইহা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই আনন্দ ও তৃপ্তির সামগ্রী। উভয়েই ইহা কামনা করে।

কিন্তু আজ দেশের বড়ই দুর্দ্দিন। সাংসারিক জীবনে তথা সমাজ জীবনে, অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। বিলাস ব্যসনের কথা বাদ দিলেও দুই বেলা দুই মুঠা অন্নের সংস্থান হওয়াই এক রকম দুরূহ বা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। যাহাও বা আহার জোটে, তা-ও যে কতদূর খাঁটি ও দেহ-পোষণীয় উপাদান-সমৃদ্ধ তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জ্ঞাত আছেন। তাহার পরেও আছে আচ্ছাদন-সমস্যা, গৃহসমস্যা, চিকিৎসা-সমস্যা—আরও বহু-বহু সমস্যা। সমস্যায়-সমস্যায় জীবন ভারাক্রান্ত—দুর্ব্বহ। কিন্তু সমাধানের উপায় এখনও অজ্ঞাত বা অনধিকৃত। যদিও বা কোনক্রমে জীবন রক্ষা পায়, শিক্ষার অব্যবস্থার ফলে ভবিষ্যৎ জীবন অনিশ্চিত, অন্ধকারাচ্ছন্ন।

শিশু তো গৃহে আসিল। সংসারের জন্য বহিয়া আনিল স্বর্গের সুষমামণ্ডিত প্রাণ-প্রাচুর্য্য। শিশুর সেই জীবন-সুষমা সংসারের প্রতিকূল আবহাওয়ায় যখন শুকাইয়া হীনপ্রভ বা বিকৃতরূপ ধারণ করে তখন পিতামাতার হৃদয়ে যে কি শক্তিশেল বিদ্ধ হয় তাহা পিতা-মাতা মাত্রই বোধ করিতে পারেন। অত সাধনার ধন, আরাধনার সামগ্রী সন্তান হয় তখন মর্ম্মপীড়ার কারণ—অশান্তির হেতু—দুশ্চিন্তার উৎস। কিন্তু যদি অল্প সংখ্যক সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তবে প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও কোনপ্রকারে তাহাদিগকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা সম্ভব হইতে

পারে। আর, বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে জননীর স্বাস্থ্যও তাহাতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা কম থাকে। কিন্তু ইহার বিপরীত অবস্থা যেখানে সেখানেই ঘটে বিপর্য্যয়, বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি। কথায় বলে, অধিক সন্তান দারিদ্র্যের লক্ষণ। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সমস্যা-বিক্ষুব্ধ জীবনে যদি অধিক সংখ্যক সন্তানের জনকজননী হইবার দুর্ভাগ্য অর্জ্জন করা যায়, তাহা হইলে অবস্থা যে কতদূর সঙ্গীণ হইয়া দাঁড়ায় ভুক্ত-ভোগী মাত্রই বুঝিতে পারিবেন।

যাহাদিগকে সংসারে আনা হল, তাহাদের প্রতি যদি যথাসাধ্য কর্ত্তব্য পালন না করা যায়,—শিক্ষায়, দীক্ষায়, চরিত্রে, স্বাস্থ্যে, সর্ব্বো-পরি মনুষ্যত্বে যদি তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ জীবনে এক-একটি পরিপূর্ণ মানুষরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারা যায়, তবে পিতামাতার পক্ষে ঘোরতর অপরাধ এমন কি মহাপাপও বলা যাইতে পারে। কারণ, জীবন ও বৃদ্ধি হইতে যাহা পতিত করে তাহাই পাপ। সন্তানের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী তাহার পিতামাতা—এবং তাহা ভূমিষ্ঠ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই। আর, সে-ক্ষেত্রে পিতা অপেক্ষা মাতার দায়িত্ব বা করণীয় অধিক। কারণ, স্বামীর নিকট হইতে সুসন্তান লাভ করি-বার ক্ষমতা নারীর আছে। শিক্ষার দ্বারা সে-ক্ষমতা নারীকে অর্জ্জন করিতে হয়। পিতা যত মহান ও কৃষ্টিসমৃদ্ধ, সহজাত-সংস্কারসম্পন্ন পুরুষ হোন না কেন, মাতা যদি তদ্ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিতা হইয়া তাহার বৈশিষ্ট্যানুসারে উদ্দীপ্ত করিয়া নিজেতে স্বামীকে আনত করিতে না পারেন তবে স্বামীর গুণরাজী ও বংশানুক্রমিকতা তিনি সন্তানে সম্পূর্ণ-রূপে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারিবেন না। তাই আমরা বহু ক্ষেত্রে

অত্যুদ্ভাসিত পুরুষের নিকৃষ্ট সন্তান দেখিতে পাই। মাতার দায়িত্ব সম্বন্ধে নারীর সর্ব্বতোভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সংসারে আনিয়া যদি সন্তানের প্রাণে আশান্তির আগুন, অশিক্ষার গ্লানি জ্বালিয়া দেওয়া হয়—তবে পিতামাতা নিজেদের কাছে তো অপরাধী হইবেনই, সমগ্র দেশের কাছেও তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন। কারণ, সুসন্তান যেমন মানব জীবনের তথা জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—কুসন্তান তেমনি সমাজ জীবনের কুৎসিৎ ব্যাধি। এ সত্য প্রতিটি পিতামাতার সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

মানুষের কাছে মনুষ্যত্বই আশা করা যায়। সে তো আর বুদ্ধি-বিবেচনা শূন্য প্রবৃত্তি-পরিচালিত পশু নহে। স্থান, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া অগ্রপশ্চাৎ হিসাব করিয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা ভগবান তাহাকে পরিপূর্ণরূপেই দিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহার সৎ ব্যবহার করিতে না পারার কোন কৈফিয়ৎই থাকা উচিত নহে।

প্রকৃত বিবাহ বলিতে যাহা বোঝায়, আর্য্য ভারতের সেই ঋষি-প্রবর্ত্তিত পবিত্র বিবাহ-সংস্কারের ভিতর বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় অনেক গলদ প্রবেশ করিয়াছে। তাই বিবাহের দুইটি মূল উদ্দেশ্য 'উদ্বর্দ্ধন ও সুপ্রজনন' সমাজের প্রতিটি স্তরেই প্রায় ব্যাহত হইতেছে। উপযুক্ত বিবাহের অভাবে, তদুপরি উপযুক্তরূপ পরিবেশ সৃষ্টির অপারগতায় ক্রমশঃই দেশে প্রকৃত মানুষের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। সুসন্তান আর জন্মগ্রহণ করিতেছে না। দেশের আজ বড়ই দুর্দ্দিন। চিন্তা করিবার বা বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে।

প্রায়শঃই আবার দেখা যায়, কষ্টের সংসারে বা অভাবের সংসারে

সন্তান-সংখ্যা অধিক হয়। আর স্বচ্ছল, লক্ষ্মীশ্রীমণ্ডিত, শিক্ষিত পরিবারে সাধারণতঃ সন্তান-সংখ্যা কম। ইহার কারণ অতি স্পষ্ট। প্রথম ক্ষেত্রে মানসিক প্রসারতা, চিত্তের উদারতা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যের চাপে নষ্ট হইয়া যায়। তদুপরি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে সহানুভূতিশীল অনুকম্পার অভাব, পরস্পরের ভিতর ভাবের আদান-প্রদানের অপ্রাচুর্য্য, অবসর সময়ে একে অন্যকে নির্দ্দোষ অথচ তৃপ্তিপ্রদ সঙ্গদানে অপারগতা ইত্যাদি অনেক সময় অধিক সন্তানের জন্মের কারণ হয়। এবং পিতামাতার মানসিক অসুস্থতার দরুণ এই সব সন্তান প্রায়শঃই সুসন্তানের পর্য্যায়ে পড়ে না। কারণ, সুসন্তান পাইতে হইলে পিতামাতাকে সর্ব্বপ্রথম পরিপূর্ণরূপে সুস্থ দেহ ও মনের অধিকারী হইতে হয়; এই ব্যাপারে আরও অনেক দিক বিবেচনা করিবার আছে। কিন্তু এইটাই হইল গোড়ার কথা। সন্তান-ধারণের মুহূর্ত্তে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক ও শারীরিক অবস্থার উপরই প্রধানতঃ সন্তানের জৈবী সংস্থিতি অনেকাংশে নির্ভর করে।

অপর ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সৎ ও উচ্চ-ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত থাকিবার মত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। সেবা, সহানুভূতি ও পরিপূর্ণ দরদের সহিত একে অন্যের প্রিয়তম বন্ধুর মত পাশে-পাশে চলিতে পারে। আশায়, ভরসায়, উৎসাহে ও উদ্দীপনায় পরস্পর পরস্পরের অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করিতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর এই প্রকার সুস্থ মিলন ও মধুর নিঃশঙ্ক উপভোগের দ্বারা বর্ত্তমান সময়ের এইরূপ প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও উভয়ের মিলিত জীবন শান্তি ও তৃপ্তিময় হইয়া উঠিবে নিশ্চয়।

অভ্যাস করিলে জগতে কিছুই অসম্ভব নয়। মানুষ বিবেক-বুদ্ধি ও সংযমের অধিকারী। অনুশীলন করিলে তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। যে-উপভোগের পিছনে মনস্তাপ ও অশান্তি বর্ত্তমান, একটু প্রয়াস করিয়া তাহা হইতে যতদূর সম্ভব অব্যাহতি লাভ করা কি উচিত নয়? জনন-নিরোধ প্রয়োজনে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া অযথা দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে কাল কাটান, স্বাস্থ্য-বিকৃতি বরণ করিয়া লওয়া কিছুতেই সমীচীন নহে এবং তাহার প্রয়োজনও নাই।

আর এ ব্যাপারে পুরুষ অপেক্ষা নারীর ক্ষমতা অধিক। নারী শক্তিময়ী—মহাশক্তির অংশে তাহার জন্ম। সে যে ভাব ও অনুপ্রেরণা পুরুষের হৃদয়ে জাগাইয়া তোলে, পুরুষ সেই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ইহাই চিরন্তন।

"কার্য্যেষু মন্ত্রী, করণেষু দাসী,
স্নেহেষু মাতা, ক্ষময়া ধরিত্রী।
শয়নেষু রামা, রঙ্গে সখী,
সা সীতা প্রিয়া মে।"

এই হইল নারীর সত্যিকারের সুস্থ রূপ। এই রকম সময়োপযোগী বিভিন্নরূপে নারী যদি তাহার পুরুষের পাশে দাঁড়াইতে পারে, তবে সমস্ত জগৎ তাহার চরণে, 'মা আমার, জননী আমার' বলিয়া ধন্য হয়, কৃতার্থ হয়। বাস্তব জগৎ হইয়া ওঠে স্বর্গ। দুঃখ, ক্লেশ, অশান্তি নারীর এই কল্যাণীরূপের স্পর্শে সুখ, শান্তি ও তৃপ্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে, জাতির এই ঘোর দুর্দ্দিনে ওঠ নারী, জাগো মাতা, দশপ্রহরণ হস্তে অসুর বিনাশ করিয়া, অশিব নাশ করিয়া

আবার জগতে সত্য শিব সুন্দরের প্রতিষ্ঠা কর। স্বামী ও সন্তানের হাত ধরিয়া মাভৈঃ মন্ত্রে তাহাদিগকে সত্যের পথে—ন্যায়ের পথে—মঙ্গলের পথে পরিচালিত কর।

কারণ, নারীই জনন-নিয়ন্ত্রী। নারী বিবেচনা-প্রসূত বিধি বুদ্ধি অনুসরণে প্রয়োজন মত নিজেই জনন নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম। আবশ্যক হইলে, শারীর ও চিকিৎসাতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট বিধি ও নিষিদ্ধ দিবসাদি লক্ষ্য করিয়া চলিলে নারী স্বয়ং প্রয়োজনমত সন্তান-জনন ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন।

নারী-জীবনে অর্থ-সমস্যা

বিংশ শতাব্দীর জীবন সমস্যা-সমাকীর্ণ। ঘরে-বাইরে বহুবিধ সমস্যায় বিংশ শতাব্দীর মানুষ জরাজীর্ণ। অর্থনৈতিক-সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, রোগ-ব্যাধিতে চিকিৎসা-সমস্যা, বেকার-সমস্যা, বাস্তুহারা-সমস্যা—নানাবিধ সমস্যার জালে উদ্‌ভ্রান্ত বর্ত্তমান যুগের মানুষ। কোন দিকেই আলো দেখতে পায় না তারা। নিরাশার আঁধারে জীবন পরিপূর্ণ। হতাশায় নিষ্প্রভ প্রাণের প্রদীপ। উৎসাহ নাই, উদ্দীপনা নাই, নাই কোন প্রকার প্রাণের সমারোহ। আনন্দ-উৎসাহ নিভে গেছে জীবন থেকে। আকাশের আলো আর ইশারায় ডাকে না—বাতাসের বাঁশি আর কানে-কানে প্রীতির সুধা ঢালে না। সবই প্রাণহীন। সমুদয়ই বিবর্ণ। দিনগত পাপক্ষয় ক'রে চলা কেবল। কেবল কোন গতিকে বেঁচে থাকা। না মরে, ধুক-ধুক করে প্রাণটুকু জিইয়ে রাখা শুধু। ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন সে-কথা। বেশী বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

স্ত্রী-পুরুষে মিলে সংসার। একে অন্যের পরিপূরক। দুইয়ে মিলে অখণ্ড এক। একজন কারণ, কার্য্য অন্যজন। একজন প্রাণ, দেহ অপরে। ভেতর একজন, অন্যজন বাহির। প্রাণ ও দেহ মিলে জীবনের কাজ অব্যাহত চলে। কার্য্য-কারণ সুসংবদ্ধ হ'য়ে সাংসারিক গতির ছন্দপতন ঘটে না। নারী-পুরুষে মিলে জীবন-যাত্রা অবাধে নির্ব্বাহ ক'রে চলে। জীবনসমুদ্র পাড়ি দেয় একে অন্যের সান্নিধ্যমধুর দখিনা বায়ের আনুকূল্যে। জীবন সহজ হয়, হয় স্বাভাবিক পরস্পরের

প্রেমসমৃদ্ধ সহযোগিতার দাক্ষিণ্যে। এই রকমই চলে আস্‌ছে সৃষ্টির আদি থেকে। কিন্তু এখন? এখন কি দেখতে পাই আমরা?

জীবনের রথ আর চল্‌ছে না যেন। একের পর আর সমস্যার উপলখণ্ডে ঠেকে রথের চাকা থেমে আসছে ধীরে। ক্রমাগত ঠোক্কর খেয়ে-খেয়ে হ'য়ে এসেছে জীর্ণ ভগ্ন। যে-কোন মুহূর্ত্তে একেবারেই ভেঙ্গে পড়তে পারে রথের চাকাটি। হয়ে উঠতে পারে জীবন পঙ্গু একেবারে। কিন্তু কী তার সমাধান? কী ক'রে রেহাই পাওয়া যেতে পারে সেই বিপর্য্যয়ের হাত থেকে? ভেবে দেখা উচিত, উচিত উপায় নির্দ্ধারণ করা। উচিত কায়মনোবাক্যে সেই উপায় মাফিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করা।

সকলের চাইতে বড় সমস্যা হল অর্থনৈতিক সমস্যা। ভাত-কাপড়ের সমস্যা। অর্থাৎ বেঁচে থাকার সমস্যা। পেটে ভাত থাকলে, পরনে একটু নেকড়া জুটলে, মাথা গোঁজবার স্থান পেলে একটু, মানুষের অভাববোধ বিশেষ কষ্ট দেয় না। মনের জোর অটুট থাকে তখন। বাইরের ঝড়-ঝাপটা আর কাহিল করতে পারে না তেমন। অন্য সব সমস্যাই তখন সমাধানযোগ্য বিবেচিত হয়। পেট ঠাণ্ডা থাকলে সবই ঠাণ্ডা মানুষের। মাথাও ঠাণ্ডা হ'য়ে জটিল বিষয় চিন্তা করতে সমর্থ হয়।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগে মধ্যবিত্ত ঘরে কয়জনের থাকে পেট ঠাণ্ডা? কতজন উপযুক্তরূপ আহার-আশ্রয় পেয়ে সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার পায়? পারে সমাজের বুকে সুস্থ দেহ-মনে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াতে?

খুব কমই পারে। বিপুল জনসংখ্যার অতি নগণ্য অংশই আজ তৃপ্ত দেহে-মনে মানুষের অধিকার নিয়ে সমাজের বুকে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করতে সমর্থ হচ্ছে। আর অন্যেরা? তাদের অবস্থা কারুরই অগোচর নাই। দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছে কেবল। চলেছে দুর্ব্বহ জীবনভার ব'য়ে শেষ পরিণতি লক্ষ্য ক'রে অসহায়ভাবে।

এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? সে প্রশ্ন থাক। সে প্রসঙ্গে যেতে চাই না এখন। এই প্রকার জীবন-চলনার জন্য কারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্ম্মপীড়া ভোগ করেন, কাদের মুখের হাসি, প্রাণের খুশী মিলিয়ে যায়, জীবন হ'য়ে দাঁড়ায় নীরস মরুভূমি, এ সমস্যা সমাধানে কারা ঘরে-বাইরে দিশাহারা হ'য়ে উপায় নির্দ্ধারণে মরীচিকার পিছনে ছুটে ক্লান্ত হয়, সেই সম্বন্ধেই কিছু বলতে চেষ্টা করবো।

নারী গৃহলক্ষ্মী। লক্ষ্মী কথা এসেছে শ্রী অর্থাৎ সেবা করা থেকে। সেবা, সহানুভূতি আর অনাবিল সাহচর্য্যের দ্বারা গৃহের শ্রী সম্পাদন করেন যিনি, তিনিই গৃহলক্ষ্মী। নারীর সহজাত সংস্কারই হল গৃহকে সুন্দর, সুশ্রী ও স্বাস্থ্যকর ক'রে গ'ড়ে তোলা আর সেই পরিবেশে তার প্রিয়তম পতি-দেবতা ও তাঁর পরিজনবর্গ সহ আপন সন্তান-সন্ততির তুষ্টি ও পুষ্টিবিধান করা। নারী—(নারয়তি) অর্থাৎ যে বৃদ্ধি পাওয়ায়। প্রিয়-পরিজনদের বাঁচিয়ে রাখা ও বৃদ্ধি পাওয়ানোই নারী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। স্বামী নারীর অস্তিত্ব। নারীজীবনের সুখ ও শান্তির উৎস হলেন স্বামী। ভালবাসা নারীর জীবন। প্রেমহীন জীবন নারীর কাছে মরুভূমি। স্বামীপ্রেম নারীর প্রাণপ্রদীপ।

আবার, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সেতু হল সন্তান। স্বামী-স্ত্রীর মিলিত জীবনে সন্তান নিয়ে আসে বৈচিত্র্য। সন্তান নারী-জীবনে পরমসম্পদ্। মাতৃত্বই নারীত্বের পরম ও চরম পরিণতি। মা হওয়ার জন্যই বিশেষ ক'রে নারীর জন্ম। নারীর দেহ-মনের প্রস্তুতিও তদনুপাতিক। বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টিরক্ষার আকাঙ্ক্ষা নারীর মাতৃরূপেই চরিতার্থতা লাভ করে। নারী ধাত্রী, নারী পালয়িত্রী, আবার নারীই মাতা—সন্তানের দেহ-মনের পরিমাপ সাধন করা নারীরই কৃতিত্ব। স্বামী ও সন্তান তাই নারী-জীবনের মেরুদণ্ড। সেই মেরুদণ্ডে যখন ব্যাধি প্রবেশ করে নারী-জীবন তখন অচল হয়। সমস্ত আলো নিভে যায় নারীর দৃষ্টির সম্মুখ থেকে। অন্ধকারে দিশাহারা হয় নারী তখন। প্রাণপণে অন্ধকার ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। আঁকু-পাকু পথ খুঁজে ফেরে। স্বামী-সন্তানের দুঃখ কিছুতেই সইতে পারে না নারী। তাদের দুর্গতিতে প্রাণ তার দিশাহারা হয়। আকুল হ'য়ে নিরাকরণের উপায় খোঁজে। কিন্তু পায় কি? দুঃখ কি তাতে কমে কিছু? স্বামী ও সন্তানের জীবন কি তাতে অনায়াস হয়? হয় কি কণ্টকশূন্য?

প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে সন্তান উপযুক্ত শিক্ষা পায় না। পায় না একজন সত্যিকারের মানুষ হ'য়ে গ'ড়ে উঠবার সুযোগ-সুবিধা। স্বামীর মুখে প্রয়োজনানুপাতিক পুষ্টিকর আহার্য্য তুলে ধরতে পারে না স্ত্রী। উপযুক্ত আহার ও বিশ্রামের অভাবে দেহ-মনের স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলেন স্বামী ধীরে-ধীরে চোখের ওপরে। নিরুপায়

অক্ষমতায় কেবল চেয়ে-চেয়ে দেখা আর দুঃসহ যন্ত্রণা বুকে চেপে রাখা ছাড়া কিছুই আর করবার থাকে না নারীর। সংসার হয় বিষাক্ত। জীবন হয় দুর্ব্বহ। হাতের কাছে অন্য কোন পথ খোলা না পেয়ে অর্থ-উপার্জ্জন-উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে পথে বের হয় নারী। যায় চাকুরীর অন্বেষণে। নারীর মন নীড়-প্রয়াসী। নিরুদ্বেগ শান্তশ্রী-মণ্ডিত আত্মীয়-পরিজন-পরিবেষ্টিত গৃহের নিরাপদ আশ্রয় নারীর চিরকালের প্রিয় বস্তু—আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী। সর্ব্বসুষমার আধার, অভাব-অভিযোগবর্জ্জিত একখানি নীড়ের পরিকল্পনা তার আবাল্যের সাধনা। তার পুতুল-খেলার জীবনের স্বপ্ন। তার বিলাসিতা নয়—তার অস্তিত্বের প্রয়োজন।

সেই গৃহ নারী ছাড়তে বাধ্য হয় অনেক দুঃখে। অনেক অভাব-অভিযোগের পীড়নে নারী তার গৃহ ছেড়ে পথে পা দিতে বাধ্য হয়। দেহ-মন কিছুই তার এ কার্য্যে সায় দেয় না প্রথমে। কষ্টসাধ্য হয় তার চাকুরীর জীবন। তবুও উপায় থাকে না তার। অর্থ-উপার্জ্জনের ধান্ধায় পথে তাকে বের হ'তে হয় বিংশ শতাব্দীর এই অর্থনৈতিক দুর্দ্দিনের কালে। গৃহের অবস্থা একটু স্বচ্ছল করবার আকাঙ্ক্ষায় নারীকে বের হতে হয় চাকুরীর খোঁজে। স্বামী ও সন্তানের দেহ-মনের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনবার জন্য করতে হয় তাকে অর্থ-উপার্জ্জন। অর্থনৈতিক সমস্যা-সমাধানের জন্য গৃহের বাহিরে কালযাপন করতে হয় তাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য।

কিন্তু সমস্যা কি তাতে সমাধান হয় কিছু? অভাব-অভিযোগ কি ঘোচে কিছু সংসারের? স্বামী-সন্তানের স্বাস্থ্য কি ফেরে তাতে?

আনন্দ কি ফিরে আসে সংসার-জীবনে আবার? হয় দুঃখকষ্টের অবসান? আলোচনা ক'রে দেখা যাক্ একটু।

কুমারী মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইছি না এখন। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে একটু আলোচনা ক'রে দেখা যাবে। যে মেয়েরা সখ ক'রে, কিম্বা ঐভাবে সময় কাটাবার জন্য ইচ্ছা ক'রে প্রয়োজন তৈরী ক'রে নিয়ে চাকুরী ক'রে বেড়ায়, তাদের বিষয়ও এ প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। যাঁরা জননী এবং গৃহিণী, যাঁরা বাধ্য হয়ে স্বামী-সন্তানের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য অর্থ-উপার্জ্জনে গৃহ ছাড়তে বাধ্য হন্, তাঁদের কথাই একটু আলোচনা করবো আমি। দেখবো বাড়তি অর্থ-উপার্জ্জন ক'রে সংসারের দুঃখ তাঁরা কতটা লাঘব করতে পারেন।

গৃহিণীকে কাজে বের হতে হয়। থাকতে হয় দীর্ঘ সময়ের জন্য সংসার থেকে অনুপস্থিত। স্বামী-সন্তানের সেবা-যত্ন, সংসারের বিলি-ব্যবস্থা কিছুই ঠিক মতন ক'রে উঠতে পারেন না, একমাত্র ছুটির দিনটিতে ছাড়া। একলা মানুষ ঘরে-বাইরে কোন দিকে সামলাবেন? তাছাড়া নিজেরও শারীরিক ক্লান্তি একটা থাকতে পারে। বাইরের কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করে এসে ঘরের দিকেও যথোচিত মনোযোগ দেওয়া সম্ভব কম—একটা মানুষের পক্ষে। সংসারের পানে তাই ঠিকমত মনঃসংযোগ করা হয়ে ওঠে না গৃহিণীর। সংসারের ভার বাধ্য হ'য়ে ন্যস্ত করতে হয় তৃতীয় কোন ব্যক্তির হাতে। সম্পর্ক আছে এমন কোন আত্মীয়া পাওয়া যায় তো ভাল, নইলে মাইনে করা দাসী-চাকরের হাতেই সংসারের ভার ছেড়ে রাখতে হয়। একটা মোটা টাকা বেরিয়ে যায় কাজের লোকের মাহিনা বাবদ অথবা তাদের ভরণ-পোষণের খরচা

ইত্যাদিতে। আর, স্বামী-পুত্রের দায়িত্ব বাইরের লোকের হাতে ছেড়ে রেখেই খুশী থাকবার চেষ্টা করতে হয় গৃহিনীকে।

কিন্তু বাইরের লোকের পক্ষে অন্যের সংসারের প্রতি উপযুক্ত দরদ থাকা স্বাভাবিক নয়। তা' আশা করতে যাওয়াও নির্ব্বুদ্ধিতা। একের সংসারের শ্রীবৃদ্ধিতে অন্যের কি স্বার্থ? নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারের স্পৃহা হবেই বা কেন সকলের এই বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক যুগে? যন্ত্রে তেল ঢাল, যন্ত্র চলবে, নইলে অচল। এ-যুগে মানুষের হৃদয় নিয়ে মাতামাতির যুগ নয়। এখন নিজের অস্তিত্ব রক্ষায়ই হিমসিম খায় মানুষ। তাই অপরের নিকট থেকে আপনার জনের মত দরদ ও সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতা আশা করাই বাতুলতা। নিজের সংসারে মানুষ বুঝে খরচ করতে পারে। যেমন আয় তেমন ব্যয় করেন গৃহিনী আপনার সংসারে। জিনিষের অপচয় বা হারান-ভাঙ্গার ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা খুবই কম গৃহিনীর চোখের উপর। অল্প জিনিষের সঙ্গে দরদ যোগ হয়ে গৃহের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়তা করে। দেহমনের দ্যুতি পরিম্লান হতে দেয় না।

কিন্তু গৃহিনী যে-সংসারে দীর্ঘ সময়ের জন্য অনুপস্থিত, গৃহের কর্ত্তৃত্ব তৃতীয় কোন ব্যক্তির হাতে, সে-সংসারের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ কিঞ্চিৎ বেশীই হবে ধারণা করা যায়। গৃহিনী বাড়তি অর্থ উপার্জ্জন করে, আনলেও, বাড়তি খরচ কিছুতেই তিনি রোধ করতে পারবেন না। আর, সারাদিনের পর বাড়ী ফিরে এ ব্যাপারটি লক্ষ্য ক'রে মনে তিনি আনন্দও পাবেন না মোটেই। বাড়তি অর্থ নিয়ে আসবে তাঁর মানসিক অশান্তি। দ্বিতীয়তঃ, সারাদিনের কর্ম্মক্লান্তির পর সন্ধ্যাবেলা

বাড়ী ফিরবেন স্বামী। কার কাছে বসে শ্রান্তি দূর করবেন তিনি? কার হাতের একটু প্রীতিমধুর সেবার পরশ পাবেন? কে দূর করবে তাঁর মনের আঁধার—প্রেম-প্রফুল্ল নয়ন-প্রদীপের আরতি শিখায়?

সে কি তাঁর উপার্জ্জন-শ্রান্ত প্রেয়সীর বিষাদ-ক্লিষ্ট অবসন্ন অবয়ব? সারা দিনের ক্লান্ত স্ত্রী পারবে কি এমনি ক'রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রীতির বাঁধন অটুট রাখতে? গৃহের প্রতি আকর্ষণ কি বজায় থাকবে স্বামীর দীর্ঘদিন? হোটেল-রেষ্টুরেন্টের খাবারের চাইতে অপরের হাতের রান্নাকরা আহার্য্য কি তাঁর কাছে অধিক সুস্বাদু বোধ হবে? একখানি প্রণয়মধুর আর প্রতীক্ষাব্যাকুল দৃষ্টি-প্রদীপের আকর্ষণ ছাড়াও গৃহের পানে মন কি স্বামীর ছুটে আসতে চাইবে আর? এ ব্যাপারটিও বিশেষ ক'রে ভেবে দেখবার জিনিষ। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমে আকর্ষণই যদি না রইলো—মনের বন্ধন যদি শিথিল হ'ল দিনের পর দিন—তবে আর রইলো কি সংসারের? দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য্য কোথায়? টাকা কি শান্তি দিতে পারে?

তৃতীয়তঃ, বাইরে যাতায়াতেরও একটা খরচ আছে আলাদা। উপযুক্ত বেশভূষা নইলে বহিরের সমাজে মান বজায় রাখা চলে না। আর,নিত্য-নতুন ফ্যাসানের যুগে নিজেকেও তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। দশজনের সঙ্গে মেলা-মেশা করতে হ'লে মাঝে-মধ্যে সহকর্ম্মীদের আদর-আপ্যায়নও করতে হয় পয়সা খরচ করে। ভদ্র ও সামাজিকতার সুনাম বজায় রাখতে হ'লে, চাকুরীতে উন্নতি করতে চাইলে, সহকারীদের খুশী রাখতেই হবে। যে-সমাজে মিশতে হবে তেমনি ক'রেই ঢেলে সাজতে হবে নিজেকে। তবে তো উন্নতির সম্ভা-

বনা সে-রাস্তায়? যে-টাকাটা সাংসারিক অনেক কিছু সুখ-শান্তি ত্যাগের মূল্যে ক্রয় করা হয়, কতটা আর তার অবশিষ্ট থাকে? এতোটা কষ্টসাধ্য বাড়তি পরিশ্রমের মজুরী পোষায়?

চতুর্থতঃ এবং মুখ্যতঃ, মাতার অনুপস্থিতিতে গৃহে সন্তান-সন্ততির অবস্থাটা কি রকম দাঁড়ায় সেইটাই বিশেষ করে দ্রষ্টব্য। সন্তানের জন্যই সংসার। বাচ্চার জন্যই নীড় রচনা। নইলে প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য সংসারের বদ্ধ গণ্ডির প্রয়োজন হয় না। হৃদয়ে প্রেম থাকলে—চক্ষুতে প্রীতির আলো জ্বললে অন্ধকার সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরেও তারা দীপালি আলোর উৎসব প্রত্যক্ষ করে। দীপাবলিশোভিত সুরম্য অট্টালিকা নইলেও জীবনযাত্রা তাদের থমকে দাঁড়ায় না।

তাই সন্তানের জন্যই গৃহের প্রয়োজন। আর, সন্তান-সন্ততির দেহ-মনের স্বাস্থের প্রয়োজনেই সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ গৃহপরিবেশ দরকার দরকার পিতামাতার প্রীতিমাখান নিবিড় সান্নিধ্য।

পিতা বাইরের কাজে ব্যাপৃত—মাতাও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, সন্তানের জীবন সেখানে কিভাবে কাটে? কার আদর-যত্নে, স্নেহ-মমতায় সে দেহ-মনের পুষ্টি পায়? সেটা কি পেতে পারে নিঃসম্পর্কীয় মাইনে-করা দাসী-চাকরের নিকট? না সে-পাওয়ায় তাদের দেহ-মনের ক্ষুধা মেটে? জীবন পুষ্টি পায়? কাজেই সেই ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্যই তাদের বাইরের দুনিয়া হাতড়ে ফিরতে হয়। মিশতে হয় বাইরের সব অবাঞ্ছিত লোকের সংসর্গে। আর, সেই তাদের অশিক্ষিত ও রুগ্ণ সাহচর্য্যে ধীরে-ধীরে বালক-বালিকাগণ একটা অপরিচ্ছন্ন ও ব্যাধি-পরিপূর্ণ জগতে প্রবেশ করে। ধীরে-ধীরে গৃহ, সমাজ ও

জাতির দেহ অশুচি-সংক্রমণে বিষাক্ত করে তোলে। এর বহুসংখ্যক নজীর মেলে শিশু-অপরাধীদের রোজ-নামচা পর্য্যালোচনা করলে। স্নেহ-মমতা জড়ানো শান্তিপূর্ণ গৃহের স্নিগ্ধ পরিবেশের অভাবেই কত জীবন যে অকালে দুষ্ট ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, আর সমাজ ও সংসারের পক্ষে সেটা যে কতদূর অপূরণীয় ক্ষতি তা' বলে শেষ করা যায় না।

সুসন্তান মানবজীবনের পরম সম্পদ্। নারী-জীবন-বৃক্ষের অমৃত ফল সুসন্তানরূপেই ঝরে পড়ে। মহাপুরুষের জননী হওয়ার গৌরব নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব। মহান্ শান্তি তার শ্রেষ্ঠ সন্তানলাভে। বাহিরের দুনিয়ার দাবী মেটাতে গিয়ে যদি সন্তানের প্রাণের দাবী উপেক্ষা করে নারী—আর তারই ফলে সন্তান যদি বিপথগামী হয়—আসে যদি সন্তানের জীবনে অমানিশার কালো মেঘ ঘনিয়ে—সে আঁধারে কি আলো ফুটবে আবার জননীগণের সাংসারিক অর্থনৈতিক কাঠামোটিকে সুদৃঢ় করবার চেষ্টায়? সংসার সচ্ছল হলেই কি মনের শান্তি পাওয়া যাবে? আসবে জীবনের সার্থকতা সেই পথে? দেশ হবে উন্নীত ভবিষ্যৎ বংশধরগণের চারিত্রিক মহিমায়?

ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

শিক্ষিকা

মা—মাগো-ও মা-মণি—শিগ্‌গীর খেতে দাও। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে—দুম্‌দাম্ ক'রে বাড়ী ঢুকলো মণি। ঘরের ভেতর দৌড়ে এলো। বই খাতা বগলে, রুক্ষ চুলের রাশি কপাল ঢেকে ফেলেছে, মুখের এখানে-সেখানে কালির দাগ। হাফ-প্যাণ্টের পেছন দিকে খানিকটা ছিঁড়ে গেছে—হাঁটু অবধি ধূলো মাখা, স্যাণ্ডেল ফটফটিয়ে সোজা চ'লে এলো ঘরের ভেতর।

ওমা—মা, হাঁক দিলো আরও জোরে। চাইলো এদিক-সেদিক। হাতের বইপত্তর ছুঁড়ে দিলো খাটের উপর। ঘরে দাপাদাপির শব্দ পেয়ে রান্না-ঘর থেকে মানদা বেরিয়ে এলো। হলুদের হাত কাপড়ে মুছতে-মুছতে এলো এগিয়ে, বললো—ওমা, তুমি এসেছো দাদাবাবু? ইস্কুলের ছুটি হ'য়ে গেল? গলার স্বর একটু নামিয়ে, স্বরে আদর ঢেলে বললো আবার—তবে এসো দাদা, হাত-মুখ ধুয়ে নাও, এসো খেতে দেই। দেখবে এসো ফুলো-ফুলো কেমন লুচি ভেজেছি। খোকার পায়ের দিকে নজর পড়তেই মানদার স্বর কঠিন হ'য়ে উঠ্‌লো—ঐ দেখ, আবার তুমি জুতো পায় শোবার ঘরে ঢুকছো? দিলে তো ঘর-দোর আবার নোংরা করে? দাঁড়াও, মা আসুন, আজ আবার আমি বলে দেব। কী ছেলে বাবা। সেদিন অত বকুনি খেলে—তাও হুঁস থাকে না? কী যে বাড়ীর ধরণ—মানদা গজগজ ক'রে উঠলো।

রুখে দাঁড়ালো মণি। চোখমুখ লাল ক'রে বললো—বেশ করবো! যা, বলগে যা মার কাছে। আমার বয়েই গেল। নালশে পোকা

কোথাকার। ভাগ্, খাবো না আমি তোর হাতে। কিছুতেই খাবো না আমি তোর হাতে। কিছুতেই খাবো না। মা এলে তখন—ছুটে আবার বেরিয়ে গেল মণি ঘর থেকে। পেছনে ছুটে এলো মানদা—ও খোকা বাবু শোনো শোনো, যেও না—খেয়ে যাও। মার আজ ফিরতে দেরী হবে। ইস্কুলে কিসের মিটিং আছে আজ। চেঁচাতে-চেঁচাতে সদর দরজা পর্য্যন্ত বেড়িয়ে এলো মানদা। মণি ততক্ষণে চলে গেছে দৃষ্টির বাইরে। সদর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে মানদা আবার ফিরে এলো রান্না ঘরে। হেঁসেলের গোড়ায় বসে কাজে মন দিলো। বাবু পাঁচটায় ফিরবেন। তাড়াতাড়ি কড়াতে খুন্তি চালাতে লাগলো মানদা আর মুখে বকবক ক'রে চললো—কী জানি বাবা কেমন বাড়ী। সবই যেন খাপছাড়া। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে কাজের চেষ্টায় এসেছিলাম, পড়েছিলাম নিঃঝঞ্ঝাট বাড়ী। একটি ছোট সংসারের দায়িত্ব নিয়ে থাকতে হবে নিজের লোকের মত। নিজের ভাবনা ভাবতে হবে না কিছু। সবই তারা বহন করবেন। খাওয়া-পড়া, ভাল হাত-খরচা। দেখা করতেই কাজও জুটে গেল।

সংসার ছোটই। ছোট ছেলে-মেয়ে আর কর্ত্তা-গিন্নী। ছোট হ'লে কি হবে। সবই যেন কেমন এলোমেলো, খাপছাড়া। সংসারে বাঁধন নাই কোন। যার-যার মতন সে-সে। কারুর সঙ্গে যোগ নাই যেন—নাই প্রাণের একটা আদান-প্রদান। গিন্নী,—যে সংসারের হাল ধরবে, সেই রইলো সারাদিন বাইরে-বাইরে। কর্ত্তা রইলেন তাঁর অফিস-কাছারী নিয়ে—তার ছেলেমেয়ে দুটি যেন উড়ুন চড়ুই। যা মনে আসছে, তাই করছে, তাই করছে—ঐ যাঃ ডালে

বুঝি পোড়া লাগলো। আটার ডেলাটা দূরে সরিয়ে রেখে, মানদা ধপ্ করে ডালের হাঁড়িটা উনুন্ থেকে নামিয়ে ফেললো। ততক্ষণে পোড়া গন্ধে বাড়ী ছেয়ে গেছে। আজ গিন্নীমা রুটীর সঙ্গে ছোলার ডাল করতে বলেছিলেন—গেল তো ডালটা ছাই হ'য়ে!—পারি না বাবু, যার সংসার সে একটিবার চোখ তুলে চাইবে না, যত দায় হয়েছে আমার—কাজ করতে এসেছি বলেই কি চুরির দায়ে ধরা পড়েছি নাকি? আমাকেই পোহাতে হবে সব? ভাল লাগে না ছাই!

হাঁড়ির তলা চাঁচতে লাগলো আর আপন মনে বকবক ক'রে চললো—পাকিস্থান হ'য়ে নিজের ঘর-সংসার কোথায় ভেসে গেল ঠিক নাই; দুটো টাকার জন্য এখন ভূতের ব্যাগার খেটে খাবো। ছড়্-ছড়্ করে ডালের হাঁড়ি উপুর করলো মানদা নর্দ্দমায়; —এ ডাল আমি কর্ত্তার পাতে দিতে পারবো না বাপু, যে রাগী মানুষ, হয়তো গায়েই ছুঁড়ে মারবেন বাটি শুদ্ধু। তাক থেকে মুগের ডালের কৌটা পাড়লো,—দেই আবার দুটি মুগের ডাল চড়িয়ে, গিন্নীমা শুধালে যা হোক একটা-কিছু বললেই হবে—আবার ডাল চড়ালো মানদা। বস্‌লো গিয়ে রুটি বেলতে—মাস চালাতে হবে এই সব ভাঁড়ারের জিনিষপত্রে, যাক্‌গে্ কর্ত্তার মেজাজ বুঝে আরও কিছু আনিয়ে নিলেই চলবে। গিন্নীমা তো আর জান্‌তে পারছেন না—কর্ত্তা-গিন্নীতে তো কথাই নেই একরকম, যে যার কাজে ব্যস্ত, খাওয়া-ঘুমোনোর সময়টি ছাড়া বাড়ীতে থাকেনই না কেউ বড় একটা। রুটি তাওয়ার উপর ফেলে বললো আবার—আমার কিরে বাপু? পরের সংসার, অত দেখ্‌তে গেলে আর গতর বাঁচে না, আমার হলো গিয়ে মাইনে পাওয়া নিয়ে কথা।

আটার গাদাতে মানদা জল মাখাতে বস্‌লো।

সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। সূর্য্যদেব পাটে বসেছেন। পশ্চিম আকাশ আবীররাঙ্গা। নীলাম্বরী সাড়ীর আঁচলে ধরণী দেহ আবৃত করছেন ধীরে-ধীরে। গলায় দুলে রয়েছে তাঁর দুগ্ধ-শুভ্র একগাছি বলাকার হার! কণ্ঠহারের হীরামুক্তার দ্যুতি প্রতিফলিত হয়েছে জোনাকী পোকার চোখের তারায়—গৃহস্থঘরের প্রদীপ-শিখায়। সীমন্তিনী সন্ধ্যারাণী জগৎ-রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হচ্ছেন ধীর পাদবিক্ষেপে সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে গা ঢেকে দশ-এগার বছরের একটি মেয়ে টালুমালু চাইতে-চাইতে চৌধুরী বাড়ীর সদর ঠেলে বাড়ী ঢুক্‌লো এ-পাশ ও-পাশ চেয়ে নিয়ে সন্তর্পণে মেয়েটি বারান্দায় উঠে এলো। লাল একটি ফ্রক্ পরা, খাটো চুলগুলি ঘাড়ে দুল্‌ছে, বড়-বড় চোখ দুটিতে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি, সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ। পিঠ থেকে বই-খাতার ব্যাগটি বারান্দায় নামিয়ে রেখে রান্নাঘরে এসে উঁকি দিলো মেয়েটি—মানুদি, মা ফেরেননি?

মানদা রান্না সেরে হেঁসেল গুছাচ্ছিলো। ভাঁড়ারের জিনিষপত্র তুলে রাখছিলো একে-একে। গলার স্বর শুনে পেছন ফিরে চাইলো—তবু ভাল যে মেয়ের এতোক্ষণে ফেরার সময় হ'ল—অপ্রসন্ন স্বরে বলে উঠ্‌লো মানদা—আজ তো শনিবার, ইস্কুলের ছুটি হয়েছে সেই দেড়টায়—এতোক্ষণ থাকা হয়েছিল কোথায় শুনি? মানদা আঁচলে হাতখানি মুছে সামনে এসে দাঁড়ালো।

রুণু এদিক-ওদিক চেয়ে চাপা স্বরে বল্‌লো—মা ফেরেননি মানুদি? মানদার স্বরে উষ্ণতা ফুটলো—সেই তো মজা হয়েছে

তোমাদের, যা ইচ্ছা যায় তাই করতে পারছো। মা থাকেন না সারাটি দিন বাড়ী,—ইস্কুলের ঝামেলা সামলাতে ব্যস্ত, আর তাঁর সংসারের সব ঝামেলা সামলাতে হবে এই আমাকে। সারাদিন পর বাড়ী ফিরে কৈফিয়ৎ তলব করবেন আমার কাছে। আর তোমরা যা' খুশী করে বেড়াবে চোপ্পর দিন। ছুটি হয়েছে সেই কখন, এতোক্ষণ বাদে বাড়ী ফেরার সময় হলো মেয়ের। যা' খুশী করো গে বাপু, মা বাড়ী ফিরলে সব কথা বলে দেব আমি আজ—গজ-গজ করতে-করতে মানদা ঘরের ভেতর পা বাড়ালো।

রুণু আগ বাড়িয়ে এসে ধরলো তাকে—অ মানুদি, শোনোই না—এই দেখ তোমার জন্য কি এনেছি আজ, এক প্যাকেট চানাচুর গুঁজে দিলো রুণু মানদার হাতে। তারপর মানদার ঈষৎ খুশী-ভরা মুখের দিকে চেয়ে চোখ বড়-বড় করে বল্‌লো—জানো মানুদি, আজ ইস্কুলের ছুটির পর লীলা, বীণা ওরা সব সিনেমায় গেল, আমাকেও ধরে নিয়ে গেল তাই। কিছুতেই যাব না আমি, মা বকবেন বললুম, কিছুতেই ছাড়লে না, জোর ক'রে ধরে নিয়ে গেল। লক্ষীটি ভাই, মা এলে বলো না যেন, আবার সেদিনকার মতন মারবেন তা'হলে—মিনতি-ভরা চোখে রুণু মানদার মুখের দিকে চাইলো—হাতখানা ধরলো খপ্‌ করে।

হাতখানা ছাড়িয়ে নিলে মানদা। গম্ভীর মুখে বল্‌লো—হ্যাঁ, তোমাকে সবাই রোজ-রোজ জোর করে সিনেমায় নিয়ে যায়, সব্বাইকার তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই কিনা, আর মায়ের হাত ব্যাগ থেকে প্রায়ই পয়সাকড়ির গোলমাল হয়—তোমরা ভাই-

বোনে তার কিচ্ছুটি জানো না। আর মা আমার দিকে কী রকম করে তাকান। আমি কচি খুকী কিনা, বুঝি না কিছুই—কাজ নেই বাপু আমার এমন চাকরী করে—আস্‌ছে মাসেই আমি এ কাজ ছেড়ে দেব, গতর খাটিয়ে খাব, তার আবার—গজর-গজর করতে-করতে মানদা ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো। দ্রুত হাতে খাটের বিছানা পাততে আরম্ভ করলো।

রুণু বই-খাতা পড়ার টেবিলে গুছিয়ে রেখে শোবার ঘরে ফিরে এলো, মানদাকে তোষক পাতায় সাহায্য করতে-করতে বল্‌লো—খেতে দেবে না মানুদি—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে যে। সেই কখন দুটি খেয়ে গেছি বলো তো? মানদা ফিক্ করে হেসে ফেল্‌লো—খাওয়ার দরকার হয় তাহলে?—ভাইটি তো না খেয়েই ছুটে পালালো।—ও, খোকা খায়নি এখনও?—ব্যস্ত স্বরে বলে উঠ্‌লো রুণু। ঐ তো মিত্তিরদের উঠোনে গুলি খেলছে দেখে এলাম। মানদা বল্‌লো—যাও তবে, তাকেও ডেকে নিয়ে এসো—আমি ততক্ষণ খাবার গুছাই—মা এসে না হলে বকাবকি করবেন আবার। হ্যাঁ যাই খোকাকে ডেকেই নিয়ে আসি—তুমি খাবার ঠিক করো। রুণু তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হ'য়ে গেল। আর মানদা গিয়ে ঢুকলো রান্নাঘরে।

বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ। সভা বসেছে। সাংস্কৃতিক সভা। স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়েছেন সভায়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ একজন সভাপতি মনোনীত হয়েছেন। গলায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে একখানি বড় চেয়ারের ওপর তিনি বসে রয়েছেন। স্কুলের একটি ছাত্রী তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে হাওয়া করছে। বহু ছাত্রী এবং

অভিভাবক, অভিভাবিকাগণ সভাস্থল জুড়ে বসে রয়েছেন। আলোক-সজ্জায় সভামণ্ডপ ঝলমল্ করছে। একজন ছাত্রী মঞ্চের ওপর ব'সে উদ্বোধন সঙ্গীত গাইলো। তারপর সভাপতির পাশে এসে দাঁড়ালেন নীলিমা দেবী—স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষয়িত্রী। তিনি সভাপতি ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনের পর গম্ভীর কণ্ঠে-শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন।

তাঁর বক্তব্যের প্রধান বিষয় হ'ল ছাত্র-জীবনের কর্ত্তব্য। কি করে ছাত্র-ছাত্রীগণ শিক্ষার মাধ্যমে তাদের নৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন ক'রে সমাজ তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে, নীলিমা দেবী তাঁর ওজস্বিনী ভাষায় তাই ব্যাখ্যা ক'রে চল্‌লেন। কেন আজ বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীগণ সর্ব্বভারতীয় প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষায় অন্য প্রদেশের ছাত্রগণের সমকক্ষতা অথবা তাদের থেকে উৎকর্ষতার প্রমাণ দিতে পারছে না? কেন আজ তারা অনেক বিষয়েই এরূপ পশ্চাৎ অপসরণশীল? কেন আজ বিশ্ববিদ্যা-লয়ের প্রায় সমুদায় পরীক্ষাগুলিতেই এতো অকৃতকার্য্যতার আধিক্য? এর জন্য দায়ী কি কেবল ছাত্রগণের মেধা বা ধী-শক্তির খর্ব্বতা অথবা তাদের অন্তর্মুখিতা পরিহার করে বহির্মুখিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে চলা?

তিনি বল্‌লেন—বহির্জ্জগতের আমোদ-প্রমোদে অধিক সময় মেতে থাকা এবং অবিভাবকগণের সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততা বা প্রতিরোধ করতে অক্ষমতাই আধুনিককালে ছাত্রজগতের এইরূপ বিপর্য্যয়ের জন্য অধিক দায়ী। তাই এ-দিকটা ভাল ক'রে ভেবে দেখতে এবং

সে-বিষয়ে অভিভাবকগণকে অবহিত হ'য়ে প্রতিকার-তৎপর হবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন নীলিমা দেবী।

আরও বললেন তিনি—বিশেষ ক'রে মায়েদের এ-বিষয়ে অবহিত হওয়া সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। জননীর সযত্ন পরিচর্য্যার ওপরই শিশুর দেহ-মনের স্বাস্থ্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। মাতার সস্নেহ অনুশাসনে শিশুজীবন পরিচালিত হ'লে তাহা অতি অল্পক্ষেত্রেই বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়। মাতৃস্নেহ-পুষ্ট শিশু কদাচিৎ বিপথগামী হয়েছে শোনা যায়। জননীর চোখের দৃষ্টি-প্রদীপের আলোয় সে তার গন্তব্যপথ ঠিকই চিনে নিতে পারে। কল্যাণদ্যুতি বিচ্ছুরিত মাতৃনয়নই শিশুজীবনের ধ্রুবতারা। তাই জাতির ভবিষ্যৎ আশাস্থল শিশুদিগের দিকে সর্ব্বাগ্রে সক্রিয় দৃষ্টি দেওয়া প্রত্যেক নর-নারীর, বিশেষ ক'রে মহিলাদের, অবশ্য কর্ত্তব্য। এ কাজ জননী ছাড়া অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভব নয়। আপন হাতে সন্তান-পরিচর্য্যা জননী-জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। অন্যথায় অনুতাপই জীবনের পাথেয় হয়।

নীলিমা দেবী তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। করতালিতে সভা-প্রাঙ্গণ মুখরিত হোল। তারপর একে-একে অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরাও এই বিষয়ের ওপর কিছু-কিছু বললেন। সভাপতির ভাষণের শেষে সভা ভঙ্গ হোল। নীলিমা দেবী বাড়ীতে ফিরলেন। সন্ধ্যা তখন অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে।

বাড়ীর সদর দরজা ভেজান ছিল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন নীলিমা দেবী। ক্লান্তিতে পা দু'টো ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। শরীর অবসন্ন। মাথাটাও ধরেছে বেশ। সেই কোন সকালে ছুটি

হাতে-ভাতে ক'রে বেরিয়েছিলেন। ক্ষিদেয় পেট জ্বালা করছে এখন। অত সকালে কীই বা এমন রান্না হয় যে পেট ভরে খাবেন, নটার মধ্যে স্কুলে বেরোতে হয়। বাসে করে অতদূর ঠিক দশটায় না হ'লে পৌঁছানো যায় না। তাই সকালে উঠে চায়ের পাট সেরে ডাল-ভাত নিজেকেই চড়িয়ে দিতে হয়। মানদা তো আসে সেই কত বেলায়—আটটার পরে। অত করে বলে-বলেও ওর সঙ্গে আর পারা গেল না। কিছুতেই একটু সকাল করে আস্‌বে না ও। সুদীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে নীলিমা দেবীর বুক থেকে। ভাল লোক আর পাওয়াই বা যায় কোথায়? সবই তো দেখা যায় অমনি। ছেলেমেয়ে দুটি ও স্বামীর কথা মনে জাগে। নিজে তো যাহোক ডাল-ভাত দুটি মুখে গুঁজে ছোটেন। ছেলেমেয়ে দুটো আর উনি যে কি খান, এক ছুটির দিনটি ছাড়া দেখবারও ফুরসুৎ হয় না। কী যে অসোয়াস্তি হয় মনে!

নীলিমা দেবী প্রাঙ্গণ পার হ'য়ে বারান্দায় উঠেন। কৈ, কারুরই তো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না? মণি, রিণি কোথায়? পড়া-শোনা করছে কৈ? এখনি ঘুমিয়ে পড়লো নাকি সাত-সকালে? কী যে জ্বালা হয়েছে? উনিই বা করছেন কি? বিরক্তিতে চোখ দুটি কুঁচকে আসে। ও দুটোকে একটু কি দেখতেও পারেন না? অভিমানে বুকখানি ফুঁসে ওঠে। চোখে ঘনায় দুশ্চিন্তার ছায়া। সারাদিনের প্রায় উপোসী দেহে ক্লান্তি আরও ছাপিয়ে ওঠে। মন হ'য়ে ওঠে উত্তপ্ত।

দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যান নীলিমা দেবী।

পাশের ফ্লাটে ছেলেমেয়েরা পড়ছে সুর ক'রে কানে আসে। ওদের মা কি যেন বুঝিয়ে দিচ্ছেন শোনা যায়। তেতলার মেয়েটি গান গাইছে হারমোনিয়াম বাজিয়ে। হয়তো মাষ্টার মশাই এসেছেন। চার পাশেই আলো, হাসি, গান, প্রাণের চাঞ্চল্য, জীবনের জয়োল্লাস। নীলিমা দেবীর ফ্লাটটি স্তব্ধ, নীরব, বাক্যহারা, মৃতবৎ, নিস্তব্ধ।

কী রে বাবা! সব গেল কোথায়? হোল কি, মন উৎকণ্ঠায় ভারি হ'য়ে এলো—। রাগ চাপা পড়লো দুশ্চিন্তার পাষাণ ভারে। ক্ষিপ্র হাতে ফ্লাটের দরজাটি টেনে খুলে ফেললেন নীলিমা।

পাশাপাশি তিনটি ঘরের ফ্লাট্। দুটি ঘর অন্ধকার। একটি থেকে কেবল আলোর রশ্মি দেখা যায়। ঘরের দোরটি ভেজান। নীলিমা দেবী ঘরের সামনেকার সরু বারান্দাখানির ওপর এসে দাঁড়ালেন। রান্নাঘরের দিকে চেয়ে দেখলেন শিকল তোলা। মানদা চলে গেছে অনেকক্ষণ। সন্ধ্যার পরই সে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে চলে যায়। দিনের কর্ত্তব্য ওর শেষ হয়। একদিনও এর ব্যতিক্রম হবার যো নাই। সনিঃশ্বাসে ভাবলেন নীলিমা দেবী— মাইনে করা লোক। কতটুকু আর আশা করা যায়? লঘু হাতে দোরটি ঠেলে ভেতরে ঢোকেন নীলিমা দেবী।

ঘরে আলো জ্বল্ছে। স্বামী ব'সে রয়েছেন জানালার ধারে ঈজি চেয়ারে। পা'দুটি চেয়ারের হাতলে প্রসারিত। হাতে ধরা বই একখানি। চেয়ে রয়েছেন বাইরের দিকে জানালা গলিয়ে। মেঝেয় মাদুর পাতা। মণি গুটীসুটি হ'য়ে ঘুমিয়ে রয়েছে মাদুরের কোণায়।

মাদুরের আর-এক পাশে ব'সে খাতায় কি যেন লিখ্ছে রিণি। দরজার আওয়াজ পেয়ে রাজেনবাবু ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন। রিণিও চাইলে মায়ের দিকে খাতা থেকে চোখ তুলে। চোখ দুটি যেন ছলো-ছলো রিণির। নীলিমা দেবী ঘরের ভেতরটা চেয়ে দেখ্লেন ভাল করে। ভাল করে বুঝবার চেষ্টা করলেন। কেমন যেন বেসুরো মনে হয়। যেন একটু অন্য রকম। রুক্ষ. চুলে ঢাকা কপালখানিতে কয়েকটি রেখা ফুটে ওঠে ধীরে-ধীরে।

নীলিমা দেবী ধীর পায়ে ঘরে এসে ঢোকেন। হাত ব্যাগটা পেরেকে ঝুলিয়ে রাখেন। আস্তে-আস্তে স্বামীর চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়ান।—আফিস থেকে ফিরে জলখাবার খেয়েছ তুমি? শরীর ভাল আছে তো? নীলিমা দেবী ব্যস্ত কণ্ঠে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন। স্বামীর দিক থেকে কোন জবাব আসে না। মুখখানি আবার জানালার দিকে ঘুরিয়ে বসেন রাজেনবাবু। নীলিমা দেবী মেয়ের দিকে ফিরে শুধালেন—তোরা বিকেলে সময়মত খেয়েছিলি তো? ছেলের দিকে চেয়ে বললেন—মণি এখনি ঘুমিয়ে পড়লো যে? পড়তে বসাস্‌নি ওকে? মেয়ে একবার বাপের মুখের দিকে আর একবার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে খাতার ওপর ঝুঁকে পড়লো।

নীলিমা দেবী কিছু বুঝ্‌লেন। কথা আর বাড়ালেন না। একটু সময় ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আল্‌না থেকে কাপড়-জামা নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন।

রাত্রি গভীর। নগরী সুষুপ্তা। রাস্তার আলোগুলি পাহারা দিয়েছে রাত জেগে। আলোর চোখেও ঘুমের কুহেলী। জড়িয়ে

আসছে চোখের পাতা। জোর ক'রে চোখ চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লাইট-পোষ্টগুলি। করছে কর্ত্তব্য প্রতিপালন। নগরীর ঘুমন্ত দেহ কুয়াশার চাদরে ঢাকা। আকাশে ইতঃস্তত মেঘের আনাগোণা। দূরে কোথায় বেজে উঠ্‌লো রিক্সার টুং-টাং শব্দ। জেগে উঠ্‌লো শিশুর কান্না নীচের ভাড়াটেদের ঘর থেকে।

নীলিমা দেবী পাশ ফিরে শুলেন। ঘুম আসছে না ভাল করে। পাতলা তন্দ্রা ভেঙ্গে যাচ্ছে, হঠাৎ চেয়ে দেখ্‌লেন ঘরের ওপাশে ঘুমিয়ে রয়েছে ছেলে-মেয়ে দুটি আলাদা খাটে। ছেলেটির মাথা বালিশ থেকে নীচে গড়িয়ে পড়েছে। মুখখানি ম্লান যেন। রাস্তার আলো এসে পড়েছে ওদের মুখে। কেমন যেন অসহায় বোধ হচ্ছে ছেলে-মেয়ে দুটিকে। মুখের গড়ন যেন আরও লম্বাটে হ'য়ে গেছে। হাত-পা-গুলো হ'য়ে পড়েছে সরু-সরু। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠ্‌লো নীলিমা দেবীর। চোখের পাতা এলো ভারি হয়ে। বালিশে চোখ-দুটি রগড়ে নিলেন একবার। চোখের দৃষ্টি আবার তক্ষুনি গিয়ে লুটিয়ে পড়লো ওদের সর্বাঙ্গে।

আহা! মন ফুঁপিয়ে উঠ্‌লো। নিঃশ্বাস এলো বিলম্বিত হ'য়ে। সারাদিন নীলিমা দেবী বাইরে কাটান। স্বামীও থাকেন ওঁর অফিস নিয়ে। তা'ছাড়া পুরুষ মানুষ তিনি, ঘর-সংসারের কতটুকু বা বোঝেন? ছেলে-মেয়ের যত্নেরই বা জানেন কি, যে ছেলে-মেয়ে দেখবেন? আর, ওঁকেই বা দেখছে কে? কে করছে একটু যত্নআত্যি, তাই খুবই খিট-খিটে হ'য়ে উঠেছেন ইদানীং। ছেলে-মেয়ে দুটি তাই কাছে ঘেঁসতেই ভয় পায়। একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে বুক ঠেলে। —পুরুষ মানুষ।

একটু আদর-যত্ন পেতে চান। তা' না পেলে ওঁদের মন-মেজাজ ঠিক থাকে না। সবই বোঝেন নীলিমা দেবী। কিন্তু উপায় কি? কী তিনি করতে পারেন? এদের সুখে রাখবার জন্যেই তো তাঁর চাকুরী নেওয়া? সংসার একটু সচ্ছল হবে বলেই না স্বামীর প্রায় অমতেই তাঁর এই শিক্ষিকার কাজটি করা? যে দিনকাল পড়েছে তাতে একজনের উপার্জ্জনের টাকায় কি আর সংসার ভাল ভাবে চলে? নাকি ছেলে-মেয়ে ঠিকমত মানুষ করা যায়? কিছুই বুঝতে চান না উনি। কী যে বিপদ হয়েছে নীলিমা দেবীর? আর ভাবতে পারা যায় না। নীলিমা দেবী পাশ ফিরলেন। স্বামীর দিকে মুখ করে শুলেন। পিছন ফিরে শুয়ে রয়েছেন স্বামী। হাতখানি মাথার ওপর দিকে ফেলা। চুলগুলি অবিন্যস্ত। বেশ বড়ও হয়েছে চুলগুলি, ঝাঁকড়া একরাশি চুলে মাথাটি ঢাকা। হয়তো কতদিন কাটা হয় না, অমন কালো মিশমিশে চুলগুলিতে একটু লাল্‌চে আভাও নেমেছে যেন। —যে ভুলো মানুষ! কোন দিকেই খেয়াল থাকে না তাঁর। এতোদিন নীলিমা দেবীই হুঁস্‌ করিয়ে দিয়েছেন সব। হয়েছেও সব ঠিকমত। এখন এতো দিকে নজর দেবার সময় নাই। —তাই হয়ও না কিছুই। নীলিমা দেবীর ভ্রূদুটি কুঞ্চিত হয় একটু। কপালে রেখা জাগে দুটি-একটি। মনটা ইষৎ উত্তপ্ত হয়। —নিজের টুকুও কি করতে পারেন না সময় মত? কী যে জ্বালা হয়েছে বাপু! কিছুই ভাল লাগে না। ছাই!—

রুক্ষ মাথাটায় আঙুল চালিয়ে চুলগুলি একটু গুছিয়ে দিতে যান নীলিমা দেবী। —ইস্‌, মাথাটা একেবারে ভিজে গেছে ঘামে।

উন্মুক্ত পিঠ গড়িয়েও নেমেছে ঘামের ধারা। সুগৌর পিঠখানি চিক-চিক্ করছে ঘামের মুক্তাবিন্দুতে। আঁচল দিয়ে পিঠখানা মুছিয়ে দিলেন। মুছে দিলেন ঘাড় ও গলা। হাত পাখাখানা নেড়ে হাওয়া করতে লাগ্লেন মৃদু-মৃদু।

স্বামী পাশ ফিরে শুলেন। চেয়ে দেখলেন একবার। নীলিমা দেবী শুধালেন—ভাল ঘুম হচ্ছে না তোমার? গরম হচ্ছে? স্বামী কথা কইলেন না। উঠে বসে মাথার শিয়রে তে-পায়ায় রাখা জলের গ্লাসটি নিয়ে জল খেলেন ঢকঢকিয়ে। নীলিমা দেবী বললেন—আমাকে বললেই তো জল দিতে পারতাম আমি। তুমি আবার উঠে নিতে গেলে কেন?

স্বামী গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন—তাতে আর কি হয়েছে, সব সময়ে তো নিজেই নিই। ওসব অভ্যাস হ'য়ে গেছে। তা'ছাড়া নিজের দরকারী কাজ নিজেই করা ভাল, মিছামিছি তোমাকে কষ্ট দিতে যাব কেন? রাজেনবাবু শুয়ে পড়লেন আবার। তোমার কি রাগ হয়েছে? বিরক্ত হয়েছ তুমি আমার উপর? কেন, কি করেছি আমি? গলার স্বরটি কেঁপে গেল ঈষৎ। রাজেনবাবু কথা কইলেন না। চুপ্ করে শুয়ে রইলেন চোখ বুঁজে। —কী, বললে না? বলো না কেন রাগ করেছ তুমি? —নীলিমা দেবী ঝুঁকে পড়লেন স্বামীর বুকের উপর। —সেই সন্ধ্যেবেলা এসে পর্য্যন্ত দেখছি, কি যেন হয়েছে তোমার। অথচ আমাকে কিছুই বল্‌ছো না। গুম্ হয়ে রয়েছ। বলো না লক্ষীটি, কী হয়েছে? কেন বকেছিলে মণি রিণিকে? কী করেছিলো ওরা? স্বামীর কপাল থেকে এলোমেলো চুলগুলি সরিয়ে

দিলেন নীলিমা দেবী। কপাল খানি মুছে নিলেন আঙ্গুলের ডগায় আঁচল জড়িয়ে। স্বামীর চোখে চোখ রেখে চুপ্ করে রইলেন একটুক্ষণ। তারপর বল্‌লেন অভিমান-ক্লিষ্ট স্বরে—কেন! আমি কি সংসারের কেউ নই? কিছুই আমাকে বলার দরকার করে না? ছেলে-মেয়ের বিষয়েও কিছু শুন্‌তে পাবো না আমি? কিছুই তুমি বল্‌বে না আমাকে? বেশ, তার কণ্ঠ বুঁজে গেল। চোখের পাতা উঠ্‌লো থরথরিয়ে কেঁপে। ঝরে পড়লো কয়েক ফোঁটা চোখের জল স্বামীর বুকের উপর।

রাজেনবাবু চোখ মেলে চাইলেন। নড়েচড়ে শুলেন একবার। ভারি গলায় বললেন—তুমি আবার কি শুন্‌বে? তোমার সময় কোথায়? তুমি টাকা উপায় করে আনছো, ব্যাস্, কর্ত্তব্য। সংসার এদিকে হেজেই যাক্, আর মজেই যাক্, তোমার তো দেখবার কথা নয়! ছেলে-মেয়ের কি হোল না হোল, তাই বা তুমি দেখবে কখন? তোমার স্কুল রয়েছে, বাইরের কাজকর্ম্ম রয়েছে, এসব সামান্য ব্যাপারে নজর দিতে গেলে কি তোমার চলে? যাক্‌গে ওসব কথা, ঘুমাই একটু। রাজেনবাবু চোখ বুজলেন আবার।

নীলিমা চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। আঁচল দিয়ে চোখ দুটি রগড়ে নিলেন একবার। তারপর বল্‌লেন—হ্যাঁ, আজ আমার ফিরতে অনেকটা দেরী হ'য়ে গেছে সত্যি। স্কুলে একটা মিটিং ছিল। না হ'লে রোজই তো প্রায় পাঁচটায়ই ফিরি? এসে আবার ঘরসংসার দেখি, ছেলে-মেয়ের তদারক করি। 'একদিনেই এতো? রাজেনবাবু ঈষৎ উষ্ণ স্বরে জবাব দিলেন—বেশ তো, রোজই তুমি দেরী ক'রে বাড়ী ফেরো না, আমার বলবার কি আছে? নিজের ঘরসংসার,

নিজের ছেলে-মেয়ে, নিজে যা ভাল বুঝবে করবে। অন্যে বল্‌তেই বা যাবে কেন? আর তা' তুমি শুনবেই বা কিসের জন্যে? রাজেন-বাবু চুপ্‌ করলেন। টেবিলের ওপর ঘড়িটি নিঃশ্বাস ফেল্‌লো টিক্‌-টিক্‌। মণি কি যেন বিড় বিড় ক'রে ব'লে পাশ ফিরে শুলো।

রাজেনবাবু সুদীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ছাড়্‌লেন। আপন মনেই বল্‌-লেন তারপর—আমার জন্যে কাউকে ভাবতে বলি না। আমার খাওয়া-দাওয়াও কাউকে দেখ্‌তে হবে না। বাড়ীতে সুবিধা না হয়, সহরে রেষ্টুরেন্টের তো আর আর দুর্ভিক্ষ পড়েনি? যেদিকে মন চাইবে, বেড়িয়ে পড়বো! চুপ করলেন রাজেনবাবু। ঘরের ভিতর স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগ্‌লো। নীলিমা দেবী নড়ে-চড়ে বস্‌লেন। পিঠের ওপর ভেঙ্গে-পড়া খোঁপা বেঁধে নিলেন দু'হাত দিয়ে। ধীরে-ধীরে বল্‌লেন, ব্যথিতস্বরে—আজ আমার সত্যিই দেরী হয়েছে। রোজই তো আর হয় না এমন! রাজেনবাবু বালিশ থেকে মাথা তুলে আধ-শোয়া হ'য়ে বস্‌লেন—রোজ হয় না ঠিক, কিন্তু প্রায়ই হচ্ছে আজ-কাল। আজ মিটিং, কাল পার্টি লেগেই রয়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছি। যত বাইরের জগতে পরিচিত হচ্ছ, ঘরে ফেরার সময় ততই পেছু হঠ্‌ছে ধীরে-ধীরে। স্কুলে পড়াচ্ছ—পরের ছেলে মানুষ করছো, ভাল কথা—পরোপকার করা মন্দ নয়? তারা যে ভেসে যাচ্ছে, তা সামলাবে কে? তার জন্যে নিজের কাছে দায়ী হ'তে হবে না ভবিষ্যতে? হবে না তার ফল ভোগ করতে? জোরে-জোরে কয়েকটা নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন রাজেনবাবু। স্বর নীচু করে আবার বল্‌লেন—সংসারে কয়েকটা টাকার সাশ্রয় করে, সে অশান্তির হাত কি এড়াতে পারা যাবে? চুপ্‌ কর-

লেন তিনি। মাথাটাকে বালিশের ওপর এলিয়ে দিলেন।

নীলিমা দেবী বিচলিতা হলেন। চোখের দৃষ্টিতে উৎকণ্ঠা জেগে উঠলো। গলার স্বরে জাগলো ঈষৎ কম্পন। স্বামীর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি বল্‌লেন—কেন? কী করেছে ওরা? আমি তো কিছুই জান্‌তে পারিনি? মানদা তো কিছু বলেও না? সেই তো ওদের দেখাশুনা করে। না বল্‌লে জানবোই বা কি করে? রাজেনবাবু থম্‌থমে গলায় জবাব দিলেন—মানদা বল্‌তে যাবে কেন? তার গরজ কিসের? তার সঙ্গে মাইনের সম্পর্ক। এতো সব ব্যাপারে মাথা গলাতে গেলে তার চল্‌বে কেন? এদের কিছু খারাপ হলে, মানদার তো তার জন্য ফল ভোগ করতে হবে না? তলা হাতড়ে দেশলাই বার ক'রে রাজেনবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। খানিকক্ষণ চোখ বুজে ধুমপান করলেন তিনি। তারপর আবার বল্‌লেন—এই তো, তোমার ছেলের ডান চোখটা বুঁজে যেত। সকালে উঠলে দেখো চোখটার অবস্থা কি হয়েছে। সারা বিকেল না খেয়েদেয়ে ও-পাড়ার বাঙ্গরদের ছেলের সঙ্গে ডাংগুলি খেলেছে। আর মার খেয়ে সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরেছে কাঁদতে-কাঁদতে। চেহারার দিকে চেয়ে দেখো একবার রাজেনবাবু ধোঁয়ার কুণ্ডলীটির দিকে চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে।

নীলিমা দেবী স্বামীর বুক ঘেঁসে সরে এলেন আরও। তাঁর তপ্ত নিঃশ্বাস রাজেনবাবুর চিবুকে স্পর্শ করলো। স্ত্রীর উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল চোখের দিকে চেয়ে তিনি আবার বল্‌লেন—আর কন্যাটি তো প্রায় রোজই স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখে বেড়াচ্ছেন। কোথা থেকে যে

পয়সা যোগাড় করেন, তা তিনিই জানেন। ভাইটিকে একটিবার দেখবারও ফুরসুৎ পান না মেয়ে! এমনি তার শিক্ষাদীক্ষার বহর। রাজেনবাবু কেশে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিলেন—কানে আসে সবই। কিন্তু বল্‌বো কাকে? আর শুনছেই বা কে? রাজেনবাবু চুপ্‌ করলেন। হাত-পা ছড়িয়ে বিছানার ওপর শুয়ে পড়লেন চিৎ হ'য়ে। বিড়-বিড় করে বললেন আপন মনে—তু'জনায় মিলে তো টাকা রোজ-গার করা হচ্ছে, অথচ সংসারে যা সাশ্রয় হচ্ছে তা' আমিই জানি। এই তো মাসকাবারে গৃহস্থালীর সব জিনিষই হিসেব ক'রে কিনে দেওয়া হয়েছে। তবুও তুমি বাড়ী থেকে বেরোলেই—এটা ফুরিয়েছে, ওটা এনে দিতে হবে—লেগেই আছে। ছেলে-মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে হুকুম তামিল করতে হয়। তা' ছাড়া নিজের-নিজের সংসার পরের হাতে ছেড়ে দিয়ে রাখ্‌লে এ রকমটা হবেই। রাজেনবাবু হাই তুল্‌লেন একটা। আড়ামোড়া ভেঙ্গে আরাম ক'রে শুলেন।

থানার ঘড়িতে ঢং-ঢং-ঢং তিনটা বাজলো। ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ কুকুর ডেকে উঠলো পাড়ার কোথায়। রাস্তা কাঁপিয়ে একখানা মোটর বেড়িয়ে গেল গলি থেকে। রাজেনবাবু পাশ ফিরলেন,—আপন মনে বল্‌লেন—যাগগে, দেখা যাক্‌ অদৃষ্ট কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়। এবার একটু ঘুমানো যাক্‌। সকালে উঠে তো আবার— চোখ বুঁজলেন তিনি।

নীলিমা দেবী বসে রইলেন, হাঁটুর ওপরে খুতনী রেখে। সাড়ে তিনটা বাজ্‌লো। আস্তে-আস্তে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি ছেলে-মেয়ের খাটের পাশে। মণির মাথাটাকে তুলে দিলেন বালিশের ওপর।